e book available

বাবুই

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

বাবুই

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

আনন্দ

কপিরাইট © স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ২০২১
প্রথম সংস্করণ: জুন ২০২১
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই বইটি এই শর্তে বিক্রীত হল যে, প্রকাশকের পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া বইটি বর্তমান সংস্করণের বাঁধাই ও আবরণী ব্যতীত অন্য কোনও রূপে বা আকারে ব্যাবসা অথবা অন্য কোনও উপায়ে পুনর্বিক্রয়, ধার বা ভাড়া দেওয়া যাবে না এবং ঠিক যে-অবস্থায় ক্রেতা বইটি পেয়েছেন তা বাদ দিয়ে স্বত্বাধিকারীর কোনও প্রকার সংরক্ষিত অধিকার খর্ব করে, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক উভয়েরই পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইটি কোনও ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্যসঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি বা অন্য কোনও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন, সঞ্চয় বা বিতরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এই বইয়ের সামগ্রিক বর্ণসংস্থাপন, প্রচ্ছদ এবং প্রকাশককৃত অন্যান্য অলংকরণের স্বত্বাধিকারী শুধুমাত্র প্রকাশক।

ISBN 978-93-5425-021-7 (print)
ISBN 978-93-5425-100-9 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: অমিতাভ চন্দ্র

বাবুই মনের ডানায় চড়ছে
উঠোন জুড়ে বকুল ঝরছে
ভূতের মতোন গাছরা নড়ছে
এবার বলো

সবার থেকে সবাই সরছে
হাওয়ায় চাঁদে আগুন ধরছে
আকাশ জুড়ে উল্কা পড়ছে
কুড়োই চলো

মনে মনে যার সঙ্গে উল্কা কুড়োই, তাকে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

অদম্য

অদম্য ২

অদম্য ৩

অসম্পূর্ণ

আমাদের সেই শহরে

আলোর গন্ধ

উনিশ কুড়ির প্রেম

এটুকু বৃষ্টি

ওম

কম্পাস

ক্রিস-ক্রস

জোনাকিদের বাড়ি

দোয়েল-সাঁকো

পাখিদের শহরে যেমন

পাতাঝরার মরশুমে

পালটা হাওয়া

প্রেমের উনিশ-কুড়ি

ফানুস

ফিঙে

ফুরায় শুধু চোখে

বুদ্বুদ

বৃত্ত

মোম-কাগজ

সেফটিপিন

হিমযুগ

“Deep Inside her heart, I was feeling my home like a hay made nest.”

—M. F. Moonzajer

সূচিপত্র

বাবুইয়ের কথা
অধ্যায় এক
অধ্যায় দুই
অধ্যায় তিন
অধ্যায় চার
অধ্যায় পাঁচ
অধ্যায় ছয়
অধ্যায় সাত
অধ্যায় আট
অধ্যায় নয়
অধ্যায় দশ

আবার বাবুই
অধ্যায় এগারো
অধ্যায় বারো
অধ্যায় তেরো
অধ্যায় চোদ্দো
অধ্যায় পনেরো
অধ্যায় ষোলো
অধ্যায় সতেরো
অধ্যায় আঠারো
অধ্যায় উনিশ
অধ্যায় কুড়ি

অবশেষে বাবুই

সে আলোর সামনে ঝুঁকে বসল। তারপর চোয়াল শক্ত করে বলল, "খুঁজে দেখ, সে ছেলে না মেয়ে। যে আমার টাকা নিয়েছে সে কি ভেবেছে সব মিটে গিয়েছে? শোন, কিছু মিটে যায়নি। কিছু মিটে যায় না। সে যদি ভাবে টাকা পেলাম, সব গুছিয়ে নিলাম আর গল্প শেষ হল, তবে সে ভুল ভাবছে! সে জানে না যে, নতুন করে আর-একটা গল্প শুরু হল এবার। রূপকথা গল্পের বইতে পাওয়া যায়। জীবনটা রূপকথা নয়। এটা মনে রাখবি।"

(কয়েক সপ্তাহ আগে)

বাবুইয়ের কথা

আমি বাবুই। না মানুষ নই, পাখি। ওই যে ছোট্ট চড়াইয়ের মতো দেখতে যে-পাখিটা সুন্দরমতো বাসা বানায়, সেই গোত্রের পাখিই আমি।

আপনারা ভাববেন না যে, আমি এখানে আমাদের প্রজাতির পক্ষ থেকে কিছু দাবি জানাতে বা প্রচার করতে এসেছি! আমি এসেছি আমার সামান্য জীবনের কথা বলতে।

কলকাতাতেই থাকি আমি। হ্যাঁ, অবাক হওয়ার কিছু নেই, বাইপাসের দিকে যেতে কালিকাপুর বলে যে-জায়গাটা আছে, সেখানে একটা বাড়ির বাগানে আমার বাসা। না, মানে ঠিক এখনও বাসা হয়নি। কিন্তু সেটা তৈরি করারই চেষ্টা করছি আমি।

বর্ষা আসবে। তার আগেই আমায় বাসাটা বানিয়ে ফেলতে হবে। না হলে কুমুদিনী অন্য কাউকে নিয়ে সংসার পাতিয়ে ফেলবে।

কুমুদিনী থাকে যাদবপুরের দিকে। ওই যে একটা বড় ইউনিভার্সিটি আছে না? তার ক্যাম্পাসের একটা নির্জন কোণের দিকে থাকে কুমুদিনী। তবে সকালের দিকে প্রায়ই এদিকে আসে ও। আসলে এমন বাগান আর পুকুরওলা এত বড় বাড়ি এই অঞ্চলে তো আর নেই। তাই নানারকম পাখি এখানে আসে ঘোরাঘুরি করতে। এটা পাখিদের পার্ক বলতে পারেন।

তা, কুমুদিনীও আসে। আর আসামাত্র ছুটকো, প্রদ্যুম্ন, বন্ডেল, সুহার্তো থেকে শুরু করে সবাই ওর পেছনে লেগে পড়ে। আমার দেখলে যা ইয়ে জ্বলে না! কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না। মনখারাপ করে পশ্চিম দিকের ওই বড় একটা কাঁঠালচাপা গাছের ডালে বসে থাকি।

গাছটার নীচে মাঝে মাঝে একটা মেয়ে এসে বসে। ছোট করে চুল কাটা। ঠোঁটের ওপরে একটা তিল। আর কী দারুণ দেখতে! না না, কুমুদিনীর মতো অত সুন্দর দেখতে নয়। তবে দারুণ দেখতে! কিন্তু মেয়েটা কেমন

যেন গোমড়ামতো। দুঃখী। রাগীও। সেদিন দেখছিলাম, একটা লোককে দেখে এমন করে তাকাল! ইদানীং লোকটাকেও আমি মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আসতে দেখি।

বাড়িটা আসলে বিশাল বড়। কমলালেবু রঙের। বহু পুরনো। এই লোকটাকে আমি আগে দেখিনি। ইদানীং, মানে মাসখানেক হল দেখছি আসছে। আর এই লোকটাকে দেখেই সুন্দরমতো মেয়েটা কী যে রাগী রাগী চোখে তাকায়!

হ্যাঁ, আমি রাগী রাগী চোখ চিনি। কারণ, ছুটকো, প্রদ্যুম্ন, বন্ডেল, সুহার্তোর সঙ্গে আড্ডা মারলেও দূর থেকে মাঝে মাঝে আমার দিকেও অমন রাগী রাগী চোখে তাকায় কুমুদিনী। কী যে করেছি আমি কিছুই বুঝি না। শুধু অমন সাইলেন্ট চোখের ধমক খেয়ে মাথা নিচু করে গিয়ে আমি বসি সতুদার কাছে।

সতুদা আমাদের সবার সিনিয়র। বাড়ি বানিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে জমাট সংসার সতুদার। লোকটা ভাল। আমায় ভালবাসে।

সতুদা আমায় দেখে বলে, "এমন ক্যালানের মতো মুখ করে আছিস কেন? যা বাসা বানা। বাসা বানালেই কুমুদিনী এসে জুটবে। জানিস না এটাই আমাদের নিয়ম? তোকে তো নিজের ওয়র্থ প্রমাণ করতে হবে, না কি! মেয়েটা কোন ভরসায় তোর কাছে আসবে বল তো? এমন দিলীপকুমারের মতো মুখ করে বসে থাকলে কিছু হবে না।"

আমি জানি হবে না। কিন্তু কী আর বলি। সতুদার কথায় মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকি।

সতুদা আবার বলে, "তোর বাবা হরিচরণদা কী দারুণ বাসা বানাত! মাস্টার উইভার যাকে বলে। তার রক্ত আছে তোর শরীরে। তুইও পারবি। বানা বানা।"

আমি তাই আজ থেকে বাসা বানানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু ঠিক পারছি না। ওইসব প্যাঁচ আর বুনোট খুব সহজ নয় কিন্তু। রেল লাইনের পাশে বড় ঘাসের জঙ্গল আছে। সেখান থেকে লম্বা ঘাস নিয়ে আসছি আমি। তারপর সেগুলো দিয়ে পুকুরের ওপর ঝুলে থাকা গাছের ডালে, পুব দিকে মুখ করে বাসা বানানোর চেষ্টা করছি। সত্যি বলছি, এখনও সুবিধে করতে পারছি না। বারবার গিঁট খুলে যাচ্ছে। প্যাঁচ ঠিক হচ্ছে না। ঘাসের সরু ফিতেগুলো স্লিপ করে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। নাজেহাল হচ্ছি আমি।

আমার চেষ্টা দেখে ওই দূরের লিচু গাছের ডালে বসে হাসছে প্রদ্যুম্নরা। আওয়াজ দিচ্ছে। উড়ে উড়ে নিজেদের মধ্যে আনন্দ করছে। আর এসবের মাঝে বসে আমার দিকে রাগী রাগী চোখ করে তাকিয়ে আছে কুমুদিনী।

বাসাটা ঠিকমতো বানাতে না-পারলে কী যে হবে! প্রদ্যুম্নদের মধ্যেই কি কেউ কুমুদিনীর সঙ্গে সংসার পাতবে? ভাবলেই বুকের মধ্যে কেমন একটা আগুন লেগে যায় আমার। এত কষ্ট হয় যে, মনে হয় পাখি থেকে শামুক হয়ে গিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে গুটিয়ে থাকি আজীবন। কুমুদিনী কি বোঝে না আমি চেষ্টা করছি? বোঝে না ওকে ছাড়া আমার এ জীবন শূন্য? কেন তবে সারাক্ষণ ওই মেয়েটার মতো রাগী রাগী চোখ করে তাকায় আমার দিকে?

আচ্ছা, কুমুদিনীরও কি ঠোঁটের ওপর অমন একটা অভিমানী তিল আছে?

এক

দোতলার ঘর থেকে সামনের বড় বাগানটা দেখতে বেশ লাগে সাজুর। কলকাতার মধ্যে এখনও যে এমন একটা বাড়ি আছে সেটা কম কথা নয়। চারদিকে ল্যান্ড শার্কদের মধ্যে থেকেও যে এত বড় বাগান আর পুকুরওলা একটা বাড়িকে বাঁচিয়ে রেখেছেন মেমদিদা সেটার জন্য ওঁকে কিছু একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত।

সাজু মাসখানেক হল এখানে এসেছে। কতদিন পর যে কলকাতাকে দেখছে! একবার তো ভেবেছিল আর আসবেই না ফিরে। কিন্তু এমন সময় দাদু মারা গেল!

দাদুর কাছেই মানুষ হয়েছিল সাজু। বাবা-মা তো আগেই মারা গিয়েছিল। তাই দাদুই ছিল জীবনের সব। কিন্তু পনেরো বছর আগে সেই দাদুই ওকে বলেছিল কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে। বলেছিল, এখানে থাকলে ওর জীবন শেষ হয়ে যাবে। আর সত্যি তো, থাকবেই-বা কেন সাজু! কার জন্য থাকবে? লাবণ্য যে অন্য একজনের সঙ্গে চলে গিয়েছে!

জীবন তারপর কত যে বদলে গিয়েছে! কলকাতা ছেড়ে প্রথমে আমদাবাদ, তারপরে এক বছর বাদেই সেখান থেকে সোজা ফ্লোরেন্স। সেখানে টেক্সটাইল কোম্পানির হয়ে এত বছর কাজ করছে ও। ফ্লোরেন্সে সাজু ডিজাইন সুপারভাইজার হয়ে গিয়েছিল। এখন সেকশন চিফ।

মিলান থেকে তৈরি হওয়া জামাকাপড়ের ডিজাইন ফ্লোরেন্সের টেক্সটাইল মিলে তৈরি হয়। তার এগজিকিউশনটা দেখতে হয় ওকে। ভালই লাগে ওর। একা, ঝাড়া হাত-পায়ের মানুষ। কাজের পর নিজের মতো থাকা। ভালই। কিন্তু আচমকা দাদু যে এভাবে মারা যাবে সেটা ভাবতে পারেনি।

দাদু নাকি শেষ জীবনে চেয়েছিল সাজু চাকরি ছেড়ে চলে আসুক ওর কাছে। কিন্তু নিজের মুখে সেসব বলেনি।

দাদুর মৃত্যুর খবর দেওয়ার সময় এসব রুনুদিই বলেছিল ফোনে। বলেছিল, "সাজু, তুই তো চলে এলেই পারিস। এখানে দাদুর বাড়িটা কে আর দেখবে! যা হয়েছিল ভুলে যা। লাবণ্য তো হিস্ট্রি। তাই না? আর তুইও অমিত রায় নোস মনে রাখিস। এখানে চলে আয়।"

সাজু যে একেবারে রাজি হয়েছিল তা নয়। বলেছিল, "তুই আর বিনি তো আছিস। তোরা দেখ না!"

"আমাদেরও তো একটা সাপোর্ট লাগে। দাদু এতদিন ছিল, এখন নেই। সাজু ফিরে আয় না!"

সাজু ভেবেছিল কথাটা। রুনুদি ওর নিজের জেঠুর মেয়ে। কিন্তু বিয়ের পরে ডিভোর্স হয়ে যায়। জেঠু জেঠিমা শিলিগুড়িতে থাকে। সেখানে কয়েক বছর ছিল রুনুদি। কিন্তু বিনির পড়াশোনার জন্য বছর বারো আগে কলকাতায় চলে আসে। তখন দাদুর কাছেই ওদের উঠতে বলেছিল সাজু। দাদু একা মানুষ, রুনুদি থাকলে দাদুর সুবিধেই হবে। দাদুও আপত্তি করেনি। তারপর থেকেই রুনুদি আর বিনি আছে ওখানে।

সেই রুনুদি চাইছিল ও ফিরে আসুক। দাদুও নাকি চেয়েছিল। কী করবে সাজু!

ও গিয়ে বলেছিল আলেসান্দ্রোকে। আলেসান্দ্রো ওর বস। ছোটখাটো মানুষ। মাথার সামনের দিকে চুল কম। গোল ফ্রেমের চশমা পরে।

আর্নো নদীর ধারে একটা ছোট্ট ক্যাফেতে বসেছিল ওরা। সাজুর থেকে সব শুনে হেসেছিল আলেসান্দ্রো। বলেছিল, "চাকরি ছেড়ো না। টেক সাম লিভ। লং লিভ। তুমি লাস্ট তিন-চার বছর তো ছুটিই নাওনি। আগে যাও। দ্যাখো। তারপর ডিসাইড কোরো। কেমন?"

মাসখানেক হল এখানে এসেছে সাজু। দাদুর শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ শেষ করে, ইনশিওরেন্সের নানান কাজ সেরেছে। তারপর দিন কয়েক হল ঝাড়া হাত-পা হয়েছে।

আসলে এভাবে বসে থাকা অভ্যেস নেই ওর। তারপর এত বছর বাইরে থেকে জীবনযাত্রাও পালটে গিয়েছে। এখানে রাস্তাঘাটে বেরলে মাথা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন তেড়ে অসভ্যতা তো অনেকদিন সহ্য করেনি। এখন ও ভাবছে কবে ফেরত যাবে।

আজ আকাশে মেঘ করে আছে। মে মাস। খুব গরম। এই মেঘের জন্য আরও যেন গরম লাগছে!

"মামু," বাইরে থেকে বিনির গলার আওয়াজ পেল সাজু।

"আয়," সাজু জানলা থেকে সরে এল। গায়ে একটা পাতলা টি-শার্ট গলিয়ে বসল বিছানায়।

দোতলাটা বেশ খোলামেলা। আলো-হাওয়া আসে। পাশের বাগান থেকে নানান পাখির ডাক শোনা যায়।

বিনি ঘরে ঢুকল। বছর কুড়ি বয়স বিনির। থার্ড ইয়ারে পড়ছে। কেমিস্ট্রি অনার্স। এর পাশাপাশি ও আবার একটা ওল্ড এজ হোমের সঙ্গেও যুক্ত। সেখানে বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কাজ করে ও। তাদের কাছে যায়। গল্প করে। বই পড়ে শোনায়। গান গায়। আর বছরে দু'বার বিনিরা কয়েকজন মিলে সেই সব বয়স্ক মানুষকে নিয়ে ঘুরতেও বেরয়।

খুব ভাল লাগে সাজুর। বিনিকে জন্মের সময় দেখেছিল। সেই মেয়েটা এখন বড় হয়ে গিয়েছে। মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের। আর তাদের দিচ্ছে এমন একটা জিনিস যা আজকাল কেউ কাউকে দেয় না। সেটা হল সময়।

"বল," সাজু বিছানার পাশে রাখা একটা বই তুলল হাতে।

বিনি বলল, "মামু, একজনকে আলাপ করাতে নিয়ে এলাম। এখন সময় হবে তোমার?"

সাজু হাসল, "বাবা, কবে থেকে এত অনুমতি নিতে শিখলি তুই?"

বিনি হাসল। তারপর ডাকল, "নমনদা, আরে ঘরে এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এসো।"

সাজু দেখল একটা ছেলে ঘরে এসে ঢুকল। লম্বা, ভাল চেহারা। কিন্তু মুখটা খুব সরল। মাথার চুল ছোট করে কাটা। দাড়ি গোঁফ কামানো। এখনকার ছেলেদের মতো গালে দাড়ি নেই।

বিনি বলল, "এই যে নমনদা, আমার মামু। সরযুনাথ রায়চৌধুরী। আর মামু, ওই হল নমন মাহাতো।"

ছেলেটা দু'হাত তুলে নমস্কার করল। এতেও সামান্য অবাক হল সাজু। আজকাল কেউ নমস্কার করে!

"বোসো," সামনের একটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে দিল সাজু।

নমন সামান্য সংকোচ নিয়ে চেয়ারে বসল। আর বিনি এসে বসল সাজুর পাশে।

বিনি বলল, "মামু, নমনদা আমার এক বান্ধবীর ভাইকে আঁকা শেখায়। একটু অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছে। যদি কোনও কাজ দেখে দিতে পারো।"

হ্যাঁ, বিনি বলেছিল বটে। একটা ছেলেকে যদি কাজ দেখে দেওয়া যায়। আসলে দাদুর শ্রাদ্ধের সময় পুরনো কিছু বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিল সাজু। তখন শোভন এসেছিল।

শোভনের বড় অ্যাড এজেন্সি আছে। কথায় কথায় শোভন বলেছিল একটা ছেলে খুঁজছে। বিনি শুনেছিল সেটা। মেয়েটার চেনা-অচেনা সবাইকে সাহায্য করার একটা ইচ্ছে আছে।

সাজু বলল, "নমন, এর আগে কোথাও কাজ করেছ?"

নমন ছেলেটা মাথা নাড়ল। বলল, "একটা কালি তৈরির ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম স্যার। সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আঁকার টিউশন করি শুধু। কিন্তু খুবই অসুবিধের মধ্যে আছি। আমি এইচএস পাশ করেছি। আর পড়াশোনা করা হয়নি। মানে, আমার মাথা ভাল ছিল না আর কী! কোনওমতে পাশ করেছি। কিন্তু খাটতে পারি স্যার। গাড়ি চালাতে পারি। যে-কোনও কাজ হলেই হবে। দরোয়ান, পিওন। যা খুশি। বাবা নেই আমার। মা আর আমি থাকি।"

সাজু মাথা নাড়ল। ছেলেটার কথার মধ্যে একটা ডেসপারেশন আছে। মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেলে যেমন হয় আর কী। খারাপ লাগল সাজুর। যে-কোনও কাজ করতে হলে করবে ছেলেটা। মানুষ কতটা অসহায় হলে এভাবে নিজেকে অন্যের সামনে খুলে ধরে!

সাজু বলল, "শোভন নামে এক বন্ধু আছে আমার। আমি ওকে বলে দেব। তুমি গিয়ে দেখা করে এসো। কেমন?"

নমন মাথা নাড়ল। মুখে কৃতজ্ঞতা।

সাজু উঠল। টেবলে রাখা একটা ছোট্ট প্যাড থেকে পাতা ছিঁড়ে নিল। তারপর নিজের মোবাইল থেকে দেখে শোভনের ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা লিখে দিল।

"নমন, এটা নাও। আমি শোভনকে বলে রাখব। তুমি কাল একবার ওকে ফোন করে নিয়ো।"

নমন কাগজটা নিল। একবার দেখল। তারপর ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

ছেলেটার মুখের মধ্যে কেমন একটা শুকনো ভাব। চোখের মধ্যে বিষণ্ণতা। কাউকে ম্লান মুখে থাকতে দেখলে কষ্ট হয় সাজুর। সেই পনেরো বছর আগের নিজেকে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় নিজের সেই দিনগুলোকে। সেই দিনগুলো, যখন ও মাঝে মাঝেই মরে যাওয়ার কথা ভাবত।

সাজু বলল, "নমন, তুমি চকোলেট খাও?"

নমন সামান্য ঘাবড়ে গেল। কী বলবে যেন বুঝতে পারল না।

"আরে, চকোলেট! খাও?" সাজু হাসল।

নমন হাসল এবার। মাথা নাড়ল।

"ওয়েট!" সাজু উঠে ঘরের বাইরে গেল।

এই ঘরটা বেশ বড়। একদিকে বসার জায়গা, আর অন্যদিকে খাওয়ার টেবিল রাখা। সামনে বড় ফ্রিজ। সেটা খুলে ভেতর থেকে একটা প্যাকেট বের করল সাজু। চকোলেট!

সেটা নিয়ে এসে ও নমনের হাতে দিল। বলল, "রাখো এটা। আর... এটাও," পাশের আলমারি খুলে নমনকে একটা ফ্রিজ ম্যাগনেট দিল সাজু। ডেভিডের মূর্তির একটা ছোট্ট রেপ্লিকা।

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!" নমন কী বলে যে ধন্যবাদ দেবে বুঝতে পারল না।

সাজু হাসল সামান্য। বলল, "কাল ফোন করে নিয়ো শোভনকে। আর এমন বিষণ্ণ মুখে থেকো না। তুমি এভাবে মনখারাপ করে থাকলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে না। শোভনের সামনে বি ব্রাইট। কেমন? নিজের থেকে এসব বললাম বলে কিছু মনে কোরো না।"

"না না স্যার। কী যে বলেন!" নমন হাসল, "আমি তা হলে আসি স্যার?"

"এত স্যার বোলো না। আমাকে সাজুদা বা মামু যা ইচ্ছে বোলো। কেমন? এসো।"

বিনি আর নমন চলে গেলে এবার উঠল সাজু। কাজ নেই কোনও, তাই ভাবল একবার কলকাতাটা ঘুরে দেখবে। কতদিন দেখেনি শহরটাকে। কিন্তু সেসব করার আগে স্নান করে নিতে হবে। এভাবে বেরতে গেলে রুনুদি দেবে বকা।

দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে, জামাকাপড় পালটে নীচে গেল সাজু। দেখল, রান্না করে যে-মানুদি, তার সঙ্গে কীসব গল্প করছে রুনুদি।

নীচে রুনুদি আর বিনি থাকে। দোতলার মতো এখানেও খাওয়ার টেবিল আছে। আর এখানেই সবাই ওরা খাওয়া-দাওয়া করে।

ওকে দেখে রুনুদি বলল, "কীরে, তুই খাবি না? ক'টা বাজে দেখেছিস? এখনও ব্রেকফাস্ট না-করলে কখন করবি? দুপুরেও খাবি তো নাকি?"

সাজু খাবার টেবিলে বসে বলল, "নারে দিদি, দুপুরে খাব না। এখন বেরব একটু।"

মানুদি এসে ওর সামনে লুচি, আলুর দম আর বোঁদে রেখে গেল।

সাজু তাকিয়ে দেখল, কম করে দশটা লুচি আছে!

সাজু তাকাল রুনুদির দিকে। তারপর বলল, "এত লুচি কে খাবে? পাড়ার লোকেদের ডাকি?"

"তুই মার খাবি! আগে তো দশ-পনেরোটা লুচি কোনও ব্যাপারই ছিল না তোর! আর এখন এসব বলছিস?"

সাজু হাসল, "আগে তো চল্লিশ বছর বয়সও ছিল না আমার! দেখছিস না জুলপিতে পাক ধরেছে। গোঁফেও কয়েকটা সাদা দাগ! তোল এগুলো।"

রুনুদি বেজার মুখ করে একটা প্লেট ঠেলে দিল সামনে। বলল, "নে তুলে দে। আর এবার একটা বিয়ে কর। আইবুড়ো হয়ে আর কতদিন থাকবি? ওই দেশেই না-হয় কর কিছু।"

"কেন বাবা? সুখে থাকতে ভূতে কিলানো কেন?" প্লেটে চারটে লুচি রেখে বাকিগুলো তুলে দিয়ে সাজু হাসল।

"বাজে কথা বলিস না। বুড়ো বয়সে কী হবে? কে দেখবে তোকে? তা ছাড়া তোর বাড়ি হয়তো আছে, কিন্তু একটা বাসা থাকা দরকার। বাড়িকে বাসা বানায় বউ, বুঝলি?"

"বাবা, কীসব বলিস!" সাজু শব্দ করে হাসল, "শোন, কেউ আর কাউকে দেখে না রে দিদি। বিয়ে ক'টা টেকে আজকাল! ওসব ভাবিস না। আমি ঠিক আছি। বুড়ো হলে ভাল কোনও ওল্ড এজ হোমে টাকা দিয়ে চলে যাব। বিনিই ব্যবস্থা করে দেবে না-হয়! একটাই জীবন, ও কেটে যাবে!"

রুনুদি তাকাল ওর দিকে। মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল আশপাশে মানুদি আছে কি না। তারপর নিচু গলায় বলল, "লাবণ্যকে এখনও ভুলতে পারিসনি, না?"

সাজু তাকাল রুনুদির দিকে। তারপর একই রকম নিচু আর সতর্ক গলায় বলল, "নারে পারিনি। সেই ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম *শেষের কবিতা* । ওই বয়সে অমন লেখা! কী করে ভুলি বল।"

"মার খাবি তুই!" রুনুদি হাসল। তারপর একটু সময় নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কী হবে এভাবে থেকে? বোকা ছেলে একটা! যাক গে শোন, এখন চড়তে বেরনোর আগে মেমদিদার সঙ্গে দেখা করে যাবি। সকালে খুদেকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল। মনে থাকে যেন।"

সাজু মাথা নাড়ল। মেমদিদা কেন ডাকছে ওকে!

রুনুদি বলল, "লাবণ্যর সঙ্গে তোর বিয়ে হোক মেমদিদা চেয়েছিল খুব। এখনও আমায় বলে। কিন্তু কী করবে বল। মেয়েটাই তো..."

"দিদি, বাদ দে। কী আর হবে! ওয়াটার আন্ডার দ্য ব্রিজ।"

রুনুদি মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "ভাই, শোন না। একটা হেল্প করবি?"

"কী রে?" সাজু এক চামচ বোঁদে তুলে নিল।

"আমার শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে পাওয়া একটা ফ্ল্যাট আছে লেক গার্ডেন্সে। আমার শ্বশুরমশাই সেটা ভাড়া দিয়েছিলেন রতিশ মান্না নামে একটা লোককে। বিনির বাবার সঙ্গে আমার বনিবনা না-হলেও বিনিকে ওর ঠাকুরদা খুব ভালবাসতেন। ফ্ল্যাটটা উনি বিনিকে দিয়ে গিয়েছেন। তবে ওই ভাড়াটে সমেত। আর সমস্যা হল, ওই রতিশ লোকটা কিছুতেই বাড়ি ছাড়ছে না। বলছে ছাড়বে না। আমরা যা পারি যেন করে নিই।"

"সে কী!" অবাক হল সাজু, "এটা আগে বলিসনি তো? কবে থেকে এমন চলছে?"

"বছর দুয়েক," রুনুদি বলল, "আরে, কী বলব আগে? তুই বাইরে। তারপর এসে দাদুর কাজ করলি! আরও সব ঝামেলা মেটালি। সেখানে নিজের এসব বলা যায়!"

সাজু বলল, "তোদের ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা দিস আমায়। আমি গিয়ে একবার না-হয় কথা বলব। টাকাপয়সা দিলে উঠবে?"

"নিজের ফ্ল্যাট। টাকা দেব কেন? শ্বশুরমশাই ওটা বিনির নামে করে দিয়েছেন। তাই ঝামেলাটা আমার। শ্বশুরবাড়ির কেউ হেল্প করবে না। রতিশ লোকটার বিরুদ্ধে কেস করাই যায়, কিন্তু জানিস তো একবার কেস করলে বছরের পর বছর চলে। রতিশ লোকটা আবার পার্টি করে! গুন্ডা টাইপ। কী যে করব বুঝতে পারছি না!"

"আমায় দিস ঠিকানা। আমি কথা বলব," সাজু উঠল।

"ঠিক আছে, তুই ফের। তারপর আমি বলছি তোকে। আর শোন দুপুরে কী খাবি?"

"এর পরেও দুপুরে খাব? তোর মনে হয়?" সাজু হাসল।

মেমদিদা হল মিলিটারি দাদুর স্ত্রী। মেমদিদা বলা হয় কারণ, দিদা সত্যি মেমসাহেব। অস্ট্রিয়ার মেয়ে। দাদু ইউএন-এর হয়ে ওখানে গিয়েছিল কাজে। সেখানেই দু'জনের প্রেম, তারপর বিয়ে।

মেমদিদা বিয়ের পরেই এখানে চলে এসেছিল। এতগুলো বছর এখানে থেকে একরকম বাঙালিই হয়ে গিয়েছে। মেমদিদার চার ছেলে। আর বড় ছেলের মেয়েই হল লাবণ্য! লাবণ্যর বাবা সদ্য রিটায়ার করেছে। বাকি তিনজন, মানে, মেজ সেজ আর ছোট ছেলে বিদেশে থাকে।

মেমদিদার দেওরের ছেলের পরিবারও এই বড় বাড়িটার এক পাশে থাকে। পনেরো বছর আগে সবাইকে শেষ দেখেছিল সাজু। তখনই খবর পেয়েছিল যে, মিলিটারি দাদুও মারা গিয়েছে। মেমদিদা তারপর থেকে একা। সত্যি বলতে কী, এখন সবাইকেই কেমন যেন অচেনা লাগে ওর।

কিন্তু মেমদিদার কাছে যেতেই হয়। সেই আগের মতো এখনও মেমদিদা খুব ভালবাসে ওকে। তাই মাঝে মাঝে ডেকে পাঠায়।

আজও বাড়িটায় ঢুকে ভাল লাগল সাজুর। বিশাল বাড়ি। কত বড় বাগান! পুকুর!

ও এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ভেতরের দিকে এগোল। দেখল, একটা বাবুই পাখি মুখে করে একটা বড় ঘাস নিয়ে উড়ে গেল সামান্য দূরের পুকুরটার দিকে। এই বাগানে অনেক পাখি আসে। দারুণ লাগে!

ও আশপাশে তাকাল। না, আজ তো দেখা যাচ্ছে না! কোথায় গেল মেয়েটা! ওই দূরে যে একটা কাঠালচাঁপা গাছ আছে, তার তলাতেই বসে থাকে টুপু। ওখানে বসেই গান শোনে। কথাও হয়েছে কয়েকবার। আজ রবিবার, ওর অফিস ছুটি। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না!

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে মূল বাড়ির ভেতর ঢুকল সাজু।

"না এদিকে নেই। ওপরে এসেছে। সেখানে গেলেই দেখতে পাবে।"

পেছন থেকে আসা গলার স্বর শুনে ফিরে তাকাল সাজু। দেখল টুপু দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে মোবাইল। কানে হেডফোনের একটা দিক খোলা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে স্নান করেছে সদ্য। খুব উজ্জ্বল লাগছে। ঠোঁটের ওপরের বাদামি তিলটা জ্বলছে যেন!

"আরে তুমি..." সাজু হাসল।

টুপু বলল, "ওপরে এসেছে। যাও।"

"কে এসেছে?" টুপুর দিকে অবাক হয়ে তাকাল সাজু।

"ন্যাকা! যেন জানে না," টুপু আর কিছু না বলে বাড়িটার অন্যদিকে ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল ওপরে।

সাজুর অবাক লাগল। কী হল মেয়েটার! কার কথা বলল?

মেমদিদার ঘরটা নীচেই। দরজার বাইরে জুতো খুলে ঘরে ঢুকল সাজু। দেখল, মেমদিদা বসে আছে বিছানায়। সামনে লুডো পাতা। একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে খেলছে দিদা।

ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে মেমদিদা হাসল। তারপর খুশির গলায় বলল, "এই সাজু, তুই জানিস কে এসেছে?"

সাজু দেখল মেমদিদার কথায় মেয়েটাও ঘুরে তাকাল ওর দিকে। তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে। কিন্তু ওকে দেখে সাজু চমকে উঠল। কে মেয়েটা!

মেমদিদা বলল, "এদিকে আয় তুই। বোস। কাল রাতেই এসেছে ওরা। গেস কর তো কে এটা। রেমি! লাবণ্যর মেয়ে!"

দুই

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষ কি জিততে পারে? নাকি সেই যুদ্ধ নিরন্তর চলতেই থাকে? মন যেটা জানে যে হওয়ার নয়, কিন্তু তবু চায় সেটাই হোক, সেই অবস্থা থেকে বেরতে হলে কী করতে হয়? নিজের কাছে নিজেকেই সেলসম্যানের মতো সেই না-হওয়াটাকে মেনে নেওয়ার জন্য সেলস পিচ করে যেতে হয়। এ এক অসহ্য অবস্থা! এর থেকে কী করে নিস্তার পাওয়া যায়? আদৌ যায় কি? কী করে মনকে বলা যায় যে, ভুলে যাও সেই কর্পূর মেশানো পারফিউমের গন্ধ। কী করে বলা যায়, তুমি মনের গভীরে যা চাও তা হওয়া সম্ভব নয়।

"আরে, তুমি এখানে বসে আছো? ভেতরে আসবে না?"

পেছন থেকে গলাটা শুনে ফিরে তাকাল টুপু। মোহিত দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে। হাতে ড্রিঙ্কের গ্লাস। মুখে হাসি।

টুপু ক্যানভাসের চেয়ার থেকে উঠল। ক'টা বাজে? ঘড়ি দেখল ও। প্রায় ছ'টা। বাপরে, একা একা বসে থাকতে থাকতে কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেল!

মোহিত মানে মোহিতলাল সেন। ও যে-অফিসে চাকরি করে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ওপরে বড় বাংলো মোহিতের। বাড়ির সামনে লন। ফুলের বাগান। পেছনের দিকে সুইমিং পুল। এখানেই একা একা বসেছিল টুপু। বাড়ির ভেতর পার্টি চলছে। কিচিরমিচির হচ্ছে খুব। কিন্তু ওর একদম ভাল লাগছে না। সব অনর্থক মনে হচ্ছে। কেবলই বহুদূর থেকে কর্পূরের ঠান্ডা গন্ধ ভেসে আসছে। ওর মন জানে এটা ঠিক নয়। ওর মন জানে এই পথের শেষে কষ্টই রয়েছে। কিন্তু তাও কিছুতেই ওই স্পেসটা থেকে বেরতে পারছে না।

আগে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না টুপু। কিন্তু ইদানীং করছে। ওর খালি মনে হচ্ছে, ওর নির্ভেজাল শান্ত জীবনে এমন করে ঝামেলা বাঁধাতে একমাত্র ঈশ্বর লেভেলের ক্ষমতাশালী ছাড়া আর কেউ পারেই না। এই চৌত্রিশ বছর বয়স অবধি ও তো দিব্বি ছিল। কিন্তু তারপর কী যে হল! ভগবান কি সত্যি এতটাই নিষ্ঠুর যে, আমাদের কষ্ট দিয়ে মজা দেখেন?

"লাজনি কাম হিয়ার। তুমি একা বসে আছ কেন?" মোহিত আবার বললেন।

টুপু হেসে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। মুখে হাসি থাকলেও মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়ে আছে ও। কী যে ঝামেলায় পড়েছে আজ এখানে এসে! কেন যে যা-হোক মিথ্যে বলে কাটিয়ে দিল না! এইসব হাই সোসাইটির পার্টিতে ওর খুব আউট অফ প্লেস লাগে নিজেকে। মনে হয় সবাই ভান করছে, অভিনয় করছে। কেউ মন খুলে কথা বলছে না। স্বাভাবিক ব্যবহার করছে না।

মোহিতের বয়স প্রায় ষাট। লম্বা-চওড়া চেহারা। মাথা সম্পূর্ণ কামানো। গালে ঘন কাঁচা-পাকা দাড়ি। সামান্য ভুঁড়ি আছে। এই বয়সেও চামড়া টান আর চকচকে। দেখলে কেউ বলবেই না এমন বয়স। চাকরির

প্রথম দিন থেকেই মোহিত ওকে পছন্দ করেন।

প্রথম প্রথম টুপু ভেবেছিল, হয়তো এসবের মধ্যে একটা অসৎ উদ্দেশ্য আছে। আসলে নানারকম গল্প শুনেছিল তো কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে। তা ছাড়া এর আগের অফিসে ওকেও তো বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়েছিল।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই টুপু বুঝতে পারে যে, তা নয়। মোহিত মানুষটার ওর দিকে তেমন দৃষ্টি নেই। বরং ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রী, ছেলে আর মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। স্ত্রী মিঠিকে বলেছিলেন, "এই দ্যাখো, তোমায় বলেছিলাম না, একদম আমার ছোটপিসি!"

টুপু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কী। ছোটপিসি মানে? ও অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মোহিতের দিকে।

মোহিত হেসেছিলেন। তারপর সামান্য বিষণ্ণ গলায় বলেছিলেন, "আমার ছোটপিসি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় যখন, আমার দশ বছর বয়স ছিল। আমার খুব ফেভারিট ছিল পিসি। কিন্তু বিহারি একটা ছেলের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। আমরা বজবজে থাকতাম তখন। অনেক চটকল ছিল সেখানে। সেই বিহারি ছেলেটি তেমনই একটা চটকলে কাজ করত। পিসি গানের স্কুলে যেত। পথে দেখা আর প্রেম।

"জানাজানি হওয়ায় বাড়িতে পিসিকে খুব মারা হয়েছিল। আটকে রাখা হয়েছিল ঘরে। বলা হয়েছিল, কেউ যেন দরজা বাইরে থেকে না খুলে দেয়।

"আমি সবার মাঝে থেকেও অসহায়ের মতো দেখতাম। ছোটপিসিই তো আমার খেলার সঙ্গী ছিল। আমায় গল্প বলত। ফুচকা খেতে নিয়ে যেত। ছাদে নিয়ে গিয়ে আকাশের তারা চেনাত। সেই পিসিকে সবাই মিলে এমন করে মারল! কেন? একটা ছেলেকে ভাল লেগেছে বলে?

"দু'-তিনদিন এমন চলার পরে এক বিকেলে আশপাশে যখন কেউ ছিল না, আমি খুব সাবধানে খুলে দিয়েছিলাম সেই দরজার তালা। তারপর পিসিকে গিয়ে বলেছিলাম যে, দরজা খোলা। পিসি এখন বাইরে যেতেই পারে। পিসি প্রথমে থমকে গেলেও, পরে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল। গালে গাল ঠেকিয়ে আদর করে বলেছিল, 'আমি ঠিক তোর কাছে ফিরে আসব, দেখিস!' সেই শেষ দেখেছিলাম পিসিকে। আর দেখিনি কোনওদিন। সেদিনের পরে সবাই কত খুঁজেছিল। কিন্তু পিসি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। পিসি কথা রাখেনি। আর ফিরে আসেনি আমার কাছে। তারপর তোমায় যেদিন দেখলাম অফিসে, আমি যে কী চমকে গিয়েছিলাম! মানে, কীভাবে এমনটা হয়! কাউকে এরকম প্রায় একরকম দেখতে হয় কীভাবে? মানে, ঠোঁটের ওপর তিলটা পর্যন্ত এক! মনে হয়েছিল তুমিই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া পিসি। সেই ছোটবেলার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ!"

টুপু এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। এদিকটায় কাচের স্লাইড দেওয়া দরজা। সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন মোহিত।

আলোয় টুপুর মুখটা দেখে একটু অবাক হলেন তিনি, "কী হয়েছে তোমার? মুখ-চোখ এমন কেন? কাঁদছিলে নাকি?"

কাঁদছিল! টুপু দ্রুত চোখে হাত দিল। সামান্য জল লাগল আঙুলে। ও অপ্রস্তুত হল। এই রে, কী যে করছে! মোহিতের দিকে তাকিয়ে হাসল টুপু। মাথা নাড়ল।

মোহিত ওর দিকে ঝুঁকে সামান্য সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "মানব কিছু বলেছে নাকি?"

মানব হল মোহিতের ছেলে। গত বছর দুয়েক ধরে টুপুর সঙ্গে রিলেশনে আছে।

টুপু মাথা নাড়ল। মানব! ও তাই তো! মানবও তো একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু সেটা যে ভুলে গিয়েছিল!

মোহিত বললেন, "আর না, এবার ভেতরে চলো। আমি তোমায় একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাই। আমার ছোটবেলার বন্ধু। ও আমার ছোটপিসিকেও চিনত। চলো!"

বাড়ির ভেতরটা পেল্লায় বড়। নীচের তলার হলঘরেই মূলত পার্টিটা হচ্ছে।

মোহিত সকলের মধ্য দিয়ে পথ করে টুপুকে নিয়ে গেল হলঘরের একপ্রান্তে। এখানে বেশ ছড়িয়ে দামি সোফা সেট পাতা। সেখানে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা যে-মানুষটি বসে রয়েছেন, তাকে দেখে সামান্য চমকে গেল টুপু। আরে, এঁকে তো সবাই চেনে। রাজ্যের এক মন্ত্রী। জিতেশ বারিক। খুবই ক্ষমতাশালী মানুষ।

মোহিত ওর সামনে গিয়ে টুপুকে দেখিয়ে বললেন, "পুচে, এই দেখ।"

জিতেশ তাকালেন টুপুর দিকে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়লেন। অবাক যে হয়েছেন সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মোহিত বললেন, "দেখলি তো! কী বলেছিলাম?"

জিতেশ হাসলেন এবার। তারপর বললেন, "সত্যি আমি ভাবতে পারছি না! তোমার কথা তো অনেক শুনেছি।"

টুপু কী বলবে বুঝতে পারল না। হাসল শুধু।

মোহিত বললেন, "শোন না পুচে, তোকে যা বলার, মানবের সঙ্গে কিন্তু ওর খুব শিগগিরি এনগেজমেন্ট হবে। আমরা হয়তো নেক্সট মান্থেই ওদের বাড়িতে যাব। তারপর বিয়ে। ওইদিনও কিন্তু আসতে হবে তোকে!"

"শুধু এলেই হবে, নাকি কোমরে গামছা বেঁধে সেই আগের মতো পরিবেশনও করতে হবে?" জিতেশ হাসলেন খুব।

মোহিত দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন, "নাঃ, সেসব দিন আর কই! লোকে বলেছিল, ভাল পড়াশোনা করলে উন্নতি হয়। তা তো হল। কোনখানে ছিলাম! সেখান থেকে কোনখানে এলাম! কিন্তু লোকে এটা বলেনি যে, নিজের মানুষের কাছ থেকে এভাবে দূরে সরে যেতে হয়।"

"আরে ঠিক আছে," জিতেশ মোহিতের পিঠে হাত দিয়ে হেসে বললেন, "বাবুর স্কচ ছাড়া চলে না, আবার সময় পেলেই এসব খুলে বসে! লাজনি তুমি পারবে এই দুঃখ-বিলাসীটাকে সামলাতে। মিঠি তো আর পারল না!"

মিঠি মোহিতের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বছর চল্লিশেক বয়স। খুবই গম্ভীর আর চুপচাপ। মিঠির বাবা দিল্লিতে ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন। মিঠি নিজেও দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়েছেন। মিঠিকে দেখলেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয় টুপুর। মনে হয়, মুখে না-বললেও মনে মনে মিঠি খুব একটা পছন্দ করে না টুপুকে। এই যে মানবের সঙ্গে সম্পর্ক, এই যে ওকে নিজের ছোটপিসির সঙ্গে সারাক্ষণ মিলিয়ে চলেন মোহিত, এতে যেন কিছুটা বিরক্তই হন মিঠি।

কিন্তু খুব ব্যালেন্সড মহিলা। কাউকে কিছু খুলে বলেন না। কিন্তু তাও চাপা একটা ভাব আছেই যে, সামান্য 'ম্যানেজার অপারেশনস'-এর একটা মেয়ে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল!

টুপু দেখল, ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন মিঠি। হাতে গ্লাস, মুখে সামান্য একফালি হাসি।

টুপুর অস্বস্তি হল। ও মোহিত আর জিতেশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সরে এল সামান্য।

চারদিকে তাকাল ও। এত বড় বাড়ি! এত বৈভব! কিন্তু এখানে খুব একটা ভাল মনে থাকে না টুপু। দিনকে দিন মনে হচ্ছে মানবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা ভুল হয়েছে। বছর দুয়েক তো হল সম্পর্কের। কিন্তু মানব অনেক বেশি মেটিরিয়ালিস্টিক। শেয়ার মার্কেট নিয়ে পড়ে থাকে সারাক্ষণ। সারা দিন মদ খায়। টাকা টাকা করে পাগল। আগে সারাক্ষণ এমন করত না। কিন্তু দিনকে দিন এমন হয়ে যাচ্ছে। আগে সারা দিনে অন্তত একবার হলেও কথা হত ওদের। এখন তাও হয় না। এই যে মোহিত ওদের বিয়ের কথা ভাবছেন, সেটা আদৌ কতটা ঠিক হবে কে জানে! আর বিশেষ করে এখন। কারণ, টুপু যে আর সেই টুপুটি নেই।

"হাই লাজনি," সামনের ভিড়ের মধ্য থেকে একটা মেয়ে এগিয়ে এল।

মেয়েটাকে চেনে টুপু। নাম ইলাক্ষী। এই বাড়িতেই দেখেছে কয়েকবার। মোহিতের মেয়ে মিতালির বান্ধবী। মেয়েটা সারাক্ষণ কেমন একটা যেন সেজে থাকে। দেখে মনে হয় কোনও বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড থেকে এইমাত্র নেমে এল।

আজও সেভাবেই সেজে রয়েছে মেয়েটা। ছোট স্কার্ট। অফ শোল্ডার টিউব টপ। আর তুলে বাঁধা চুল। দু'গালে অভ্রর মতো কী যেন লাগানো।

টুপু দাঁড়াল। কেউ ডাকলে তো আর অসভ্যের মতো মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া যায় না।

ইলা পায়ের স্টিলেটোটায় নিজেকে ব্যালেন্স করতে করতে এগিয়ে এল। হাতে একটা গ্লাস। টুপুর মনে হল বলে যে, মেক-আপ না-করলেই মিষ্টি লাগে ইলাকে। কিন্তু তারপর ভাবল, না বলবে না। এখন এমন একটা সময়ে সবাই বাস করছে, যেখানে সবাই অদরকারি জায়গায় সেন্টিমেন্টাল হয়ে আছে।

ইলা বলল, "শোনো না, ওই যে তুমি কথা বলছিলে না... মানে জিতেশবাবু... ওঁর সঙ্গে আমায় একটু আলাপ করিয়ে দেবে?"

"আলাপ? আমার সঙ্গেই আজ এইমাত্র আলাপ হল। সামান্য পরিচয়। আমি তোমায় আলাপ করাতে গেলে অকোয়ার্ড লাগবে যে! তুমি স্যারকে বলো না, উনি করিয়ে দেবেন," টুপু শান্তভাবে উত্তর দিল।

ইলা কেমন যেন চুপসে গেল। আসলে মোহিত ওর সামনেই নরম-সরম। কিন্তু আসলে খুবই রাশভারী মানুষ।

টুপুর ইলাকে দেখে কষ্ট হল। কত বয়স হবে মেয়েটার? পঁচিশ-ছাব্বিশ। খুচখাচ মডেলিং করে। কিন্তু এখন শুনছে সিনেমায় ঢুকতে চায়। মিতালি একদিন বলছিল। বলছিল, ইলা ডেসপারেটলি চেষ্টা করছে। কিন্তু ব্রেক থ্রু হচ্ছে না।

টুপু ইলাকে বলল, "আরে, যাও না! উনি তো মন্ত্রী মানুষ। কত লোক তো এমনিই কথা বলে। তুমিও যাও। অটোগ্রাফ চাও। সেলফি তোলো। অসুবিধে কী! আর তেমন হলে মিতালিকে বলো। শি উইল হেল্প ইউ!"

ইলা মাথা নাড়ল। কিন্তু মুখ দেখে টুপু বুঝল যে, মেয়েটা ভরসা পাচ্ছে না।

"লাজনি..." মানবের ডাক শুনে ইলাকে পাশে রেখে এগিয়ে গেল টুপু।

মানব একটা সামার শার্ট আর থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরে হলের একদিকে যে দোতলায় উঠে যাওয়ার ডিস্ট্রেসড উডের সিঁড়ি রয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

টুপু সামনে গিয়ে হাসল। চারদিন পরে মানবের সঙ্গে কথা হচ্ছে ওর।

"কাম আপ," মানব ওর দিকে তাকিয়ে ডাকল, "এখানে ভিড়ে কী করছ?"

টুপু কথা না-বাড়িয়ে মানবের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

ওপরের ফ্লোরটা যেন আরও বড়। কিন্তু নির্জন। পার্টি যা হচ্ছে সব নীচে। এখানে বাইরের লোকের আসা একরকম বারণ।

দোতলায় উঠেই একটা বড় বসার জায়গা। সাদা আপহোলস্ট্রি। কিন্তু আলোগুলো এমন করে সারা ঘরময় লাগানো আছে যে, চোখ ঝলসে যায় না।

এই হল থেকে একটা করিডোর ধরে এগোলে মানবের ঘর। মানব ওই দিকেই হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল টুপুকে।

মানবের ঘরটা বড়। কিন্তু অগোছালো। টুপু দেখল টেবিলের ওপর ল্যাপটপ খোলা। বিছানায় জামাকাপড় ছড়ানো। মাটিতে চার-পাঁচ জোড়া জুতো পড়ে আছে।

টুপু বিরক্ত হল। বলল, "কী করে রেখেছ ঘরটাকে?"

মানব উত্তর না-দিয়ে আচমকা টুপুর কোমর ধরে টেনে নিল নিজের দিকে।

"আরে," টুপু বলতে গেল কিছু, কিন্তু পারল না। মানব নিজের ঠোঁট চেপে ধরল ওর ঠোঁটে। জিভটা জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল মুখের মধ্যে। তারপর ওর কোমর ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলল বিছানায়।

যেন নরম ঘাসের মধ্যে ডুবে গেল টুপু। মানব ঠোঁট কামড়ে ধরেছে ওর। এক হাত দিয়ে ওর গাউনের জিপারটা খোলার চেষ্টা করছে। মানবের মুখ থেকে মদ আর সিগারেটে মেশানো একটা বাজে গন্ধ আসছে।

টুপু নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল।

মানব এক মুহূর্তের জন্য টুপুর ঠোঁট থেকে নিজের ঠোঁট সরিয়ে বলল, "প্লিজ, আজ চাই। একবার। প্লিজ প্লিজ... অনেকদিন হয়নি... আজ একবার প্লিজ..."

"না..." টুপু আটকাতে চাইল, "আমার পিরিয়ড হয়েছে... আরে..."

"মিথ্যে কথা। লেট মি সি..." মানব জোর করে আবার ঠোঁটে কামড়ে ধরল। আর আবার বাজে গন্ধটা দ্বিগুণ হয়ে যেন ফিরে এল।

"মানব নো," টুপু চিৎকার করল।

মানব শুনল না। একটানে গাউনটা খুলে দিয়ে জোর করে নিজেকে প্রবেশ করাল ওর মধ্যে।

রাগ, বিরক্তি আর যন্ত্রণায় সারা শরীর কেঁপে উঠল টুপুর। ও কষ্ট সহ্য করতে গিয়ে খামচে ধরল মানবের টি-শার্ট। বন্ধ করে নিল চোখ। আর এখান থেকে পালিয়ে যেতেই যেন স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে চাইল কর্পূর আর ফুল-মেশানো সেই গন্ধটা। মানবের তলায়, ওর চাপ সহ্য করতে করতে টুপু যেন দেখতে পেল ওদের বাড়ির পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ অবাক হয়ে দেখে যাচ্ছে আনাড়ি একটা বাবুইপাখির বাসা বানানোর চেষ্টা।

তিন

অফিসটা বেশ বড়। চকচকে। আলো আর কাচ দিয়ে বানানো এক ইন্দ্রপ্রস্থ যেন!

এমন অফিসে এলে কেমন একটা হীনম্মন্যতায় ভোগে নমন। ও যে-রিসেপশনটায় বসে রয়েছে, সেটাই এত বড় যে ফাইভ-আ-সাইড একটা ফুটবল মাঠ ঢুকে যাবে। সোফাগুলোও কী নরম! নিজের বাড়ির চৌকি আর পাতলা তোশকের বিছানায় শুয়ে শুয়ে শরীরটাই কেমন যেন কাঠের মতো হয়ে গিয়েছে নমনের। এসব জায়গায় এলে তাই খেই হারিয়ে ফেলে ও। ভাবে, এখানে কারা আসে?

শোভন ব্যানার্জির অফিসটা যে এমন হবে, বুঝতে পারেনি নমন। সরযুর লিখে দেওয়া ফোন নম্বরে ফোন করার পরে শোভন এমন করে কথা বলেছিল যে, নমন ভেবেছিল ছোটখাটো কোনও অফিস হয়তো।

শোভন বলেছিল, "সাজু তোমায় বলেছে আমাকে ফোন করতে? ঠিক আছে। আঠারো তারিখ চলে এসো। সকাল এগারোটায় আসবে। রিসেপশনে আমি বলে রাখব তোমার নাম। আমাদের ছোটখাটো অফিস, বেশি লোকজন আসে না। ফলে অসুবিধে হবে না।"

ছোটখাটো অফিস! এ যে ময়দানবের প্রাসাদ! পার্ক স্ট্রিটের পুরনো বাড়ির মধ্যে এমন একটা দারুণ ঝকঝকে অফিস করে রাখা আছে, সেটা বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই।

আজ নিজের সবচেয়ে ভাল জামাকাপড়টা পরে এসেছে নমন। ক্রিম রঙের শার্ট আর ঘন নীল রঙের প্যান্ট। জুতোটাও পালিশ করিয়েছে। যদিও গোড়ালির কাছে সেলাইটা খুলে গিয়েছে, তবে প্যান্টে ঢাকা আছে, বোঝা যাবে না।

এই জামা-প্যান্টটা পাঁচ বছর আগের। এই একটাই সেট আছে যেটা ভাল। বাকিগুলো তো আর বলার মতো অবস্থায় নেই।

আজ সকাল থেকে মায়ের শরীরটা ভাল আছে। মা কথা বলছে। হাসছে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে নমন। আসলে গত কয়েকদিন এত চিন্তায় ছিল যে বলার নয়।

ছোটবেলায় কিন্তু এমন ছিল না ব্যাপারটা। কিন্তু কুড়ি বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই যে মায়ের কী হল কে জানে! ও সাধ্যমতো ডাক্তার দেখিয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু হয়নি বিশেষ। এমনি ভালই থাকে মা। কিন্তু তারপর আচমকা কেমন যেন একটা তলিয়ে যাওয়ার ভাব হয়। দিনের পর দিন কাটে, মা কথা বলে না। বিছানা থেকে উঠতে চায় না। খেতে চায় না। যেন একটা অন্ধকার কুয়োর মধ্যে ঢুকে থাকে। তখন কিছু বললেও মা শোনে না। কোনও কথার উত্তর দেয় না। এর সঙ্গে ইদানীং জুড়েছে হার্টের সমস্যা।

নমন আর ওর মা থাকে মনোহরপুকুর রোডের ছোট্ট দু'কামরার একটা বাড়িতে। ঠাকুরদার বাড়ি এটা। বাবা একটা ভাগ পেয়েছে।

বাবার একটা দোকান ছিল। বেশ বড় জায়গা। কিন্তু সেটা বাঁচানো যায়নি। বাবার ক্যানসারের চিকিৎসা করতে গিয়ে দোকানটা ওরা বন্ধক রেখেছিল রুপিন দারুওয়ালার কাছে। যদিও তাতে লাভ হয়নি। বাবাকে

বাঁচানো যায়নি।

সেটা পাঁচ বছর আগের ঘটনা। তারপর থেকে দোকানটা তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। রুপিন খারাপ লোক নয়। কিন্তু ব্যবসায়ী মানুষ। তাই এতদিন কিছু বলেনি। কিন্তু এবার বলছে।

রুপিন বলছে টাকাটা মিটিয়ে দোকানটা যেন ছাড়িয়ে নেয় নমন। কারণ, রুপিনরা এখানের পাঠ তুলে চলে যাচ্ছে পন্ডিচেরি। আর নমন যদি টাকা জোগাড় করতে না পারে, রুপিনকে দোকানটা অন্য কাউকে বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা দেখতে হবে।

রুপিনকে দোষ দেয় না নমন। পাঁচ বছরের মধ্যে একবারের জন্যেও টাকার ব্যাপারে তাগাদা দেয়নি বা খারাপ কথা বলেনি রুপিন। কিন্তু এখন সত্যি যখন ওদের চলে যেতে হবে, তখন কী আর করবে লোকটা!

বাবার জন্য দশ লাখ টাকা নিতে হয়েছিল রুপিনের কাছ থেকে। রুপিন এতটাই ভাল যে, কোনওরকম সুদও চাইছে না। বলেছে, "দেখ নমন, আমরা স্বামী-স্ত্রী থাকি। মেয়ের বিদেশে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বেকার টাকাপয়সার খাঁই আমাদের নেই। তাই যেটা নিয়েছিস সেটা দিলেই হবে। জানি সেটা দিতেও তোদের অসুবিধে হবে। কিন্তু এর বেশি আমি আর কী করতে পারি বল!"

দোকানটা একদম মনোহরপুকুরের ওপর। বড়ও বেশ। দারুণ জায়গা! রুপিন বিক্রি করতে চাইলে খদ্দেরের অভাব হবে না।

কিন্তু দোকানটা রাখতে চায় নমন। ওর আসলে ইচ্ছে ছিল একটা স্পোর্টস গুডসের দোকান খোলে ওখানে। তবে হবে না। ও বোঝে, সেসব আর হবে না। কে দেবে দশ লাখ টাকা? তারপর দোকান সাজানোর পুঁজিও লাগবে। সেসব দেওয়ার যে কেউ নেই।

তাই অন্তত কিছু একটা এবার জুটিয়ে নিতে হবেই। আর উঞ্ছবৃত্তি করে দিন কাটছে না। কালির কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যে কী বিপদে পড়েছে! চারদিকে সারাক্ষণ শুনছে সব কোম্পানি নাকি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সবাই নাকি লস করছে। এত বড় একটা দেশের এত এত মানুষ! তারা তা হলে কী করে বাঁচবে? কী খাবে? নমনের মাথা মাঝে মাঝে একদম গুলিয়ে যায়। এখনও তেমনই হয়ে আছে। শোভনের কাছে যদি কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়, তা হলে অন্তত খেয়েপরে একটু ভদ্রভাবে বাঁচতে পারবে।

নমন মোবাইলটা বের করল। ছোট্ট সাদা-কালো বোতাম-টেপা মোবাইল। সামনের কাচটা সামান্য ঘষে গিয়েছে। তবে কাজ চলে যায়।

নমন দেখল এগারোটা কুড়ি বাজে। কী জানি কখন ডাকবে ওকে। মোবাইলটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। চারদিকে আজকাল কত উন্নত সব মোবাইল নিয়ে লোকজন ঘুরে বেড়ায়। দুটো-তিনটে করে ক্যামেরা সব ফোনের সঙ্গে। বড় স্ক্রিন। চকচকে ব্যাপার। সেখানে এই মোবাইলটা যেন ভিটেমাটি হারানো মানুষের মতো।

"মিস্টার নমন মাহাতো। আপনি ভেতরে যান। ডান দিকে সোজা গিয়ে বাঁ হাতে সেকেন্ড গ্লাস ডোর।"

নমন উঠল। পাশে রাখা পলিথিনের প্যাকেটটা তুলল। এর মধ্যে সামান্য যে পড়াশোনা আর খেলাধুলো করেছে, তার স্মারকচিহ্ন নিয়ে এসেছে। মার্ক শিট, এইচএসের সার্টিফিকেট। স্পোর্টসের সার্টিফিকেট। আঁকার সার্টিফিকেট। ও জানে না কোনটা কী কাজে লাগবে।

সবুজ পাথরের মেঝে। মুখ দেখা যাচ্ছে। কাচের চেম্বারটা পেতে অসুবিধে হল না নমনের। ও ফ্রস্টেড গ্লাসের দরজায় নক করে ঢুকল।

শোভনকে দেখে একটু থমকে গেল নমন। ও ভেবেছিল সাজুর মতোই বয়স হবে হয়তো। কিন্তু শোভনকে দেখলে তো বছর পঞ্চাশেক লাগছে। সারা মাথায় কাঁচা কম পাকা চুল বেশি। চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা।

শোভনের সামনে একজন লোক বসে। তারও বয়স বছর পঞ্চাশেক মতো। মাথায় টাক। গালে চাপদাড়ি।

"কাম কাম, সিট," শোভন হাত দিয়ে সামনের চেয়ার দেখাল।

সামান্য কুঁকড়ে বসল নমন। শোভন টেবিলে পাতা একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে সামনে হাত বাড়াল। মানে, কিছু একটা চাইছে। কী চাইছে! ও আচ্ছা, ওর কাগজপত্র।

প্লাস্টিকের ফাইলটা সামনে বাড়িয়ে দিল নমন।

শোভন সেটা থেকে কাগজপত্র বের করে দেখল সময় নিয়ে। তারপর আবার প্লাস্টিকের ফাইলে ঢুকিয়ে সামনের টেবিলে রেখে বলল, "তুমি কলেজ পাশ করোনি?"

"না স্যার, আসলে বাবা মারা যাওয়ার পরে..."

"আরে, কিসের জন্য কী সে জেনে আমি কী করব!" শোভন যেন বিরক্ত হল, "এন্ড রেজাল্ট ম্যাটার্স! আমাদের এখানে তো ভাই যে-চাকরির জায়গা আছে তাতে মিনিমাম গ্র্যাজুয়েট লাগবেই। সাজুর কথায় তোমায় ডাকলাম, কিন্তু সরি কিছু করতে পারছি না!"

নমন কী বলবে বুঝতে পারল না। শোভন লোকটার চোখেমুখে কেমন যেন বিরক্ত ভাব।

নমন হাত বাড়িয়ে প্লাস্টিকটা নিল। তা হলে তো আর বসে থাকার মানে হয় না। ব্যাপারটা যে এমন করে পাঁচ মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে সেটা ও বুঝতে পারেনি। নিজেকে কেমন হেরো আর ছোট লাগছে। কলেজ পাশ করোনি— প্রশ্নটার মধ্যে এমন একটা অবহেলা ছিল যে, সচিন তেন্ডুলকরও এই লোকটার সামনে এলে লজ্জায় গুটিয়ে যেত।

"আমি একবার দেখতে পারি?" পাশে বসে থাকা মানুষটা এবার নমনের দিকে হাত বাড়াল।

নমন সামান্য ঘাবড়ে গেল। কী বলবে বুঝতে পারল না। লোকটা কে? ওর ফাইল দেখেই-বা কী করবে?

শোভন এবার হালকা গলায় বলল, "আরে দাও। ওঁর নাম বিজন দাস। আমাদের ক্লায়েন্ট। বর্ধমানে চালকল আছে। কলকাতাতেও ফ্রুট জুসের কোম্পানি আছে। একটা প্রোডাকশন হাউসও আছে। নানান ব্যবসা করেন। দাও।"

নমন বাড়িয়ে দিল কাগজপত্র।

বিজন সময় নিয়ে দেখলেন সব কিছু। তারপর বললেন, "তুমি আঁকো আবার স্পোর্টসেও আগ্রহ? হাইট কত?"

"হ্যাঁ স্যার, সাঁতার কাটতাম। সুইমার ছিলাম। তবে আর কাটা হয় না। হাইট ছ'ফুট আড়াই ইঞ্চি।"

বিজন হাসল, "দ্যাখো, আমার কাজটা হল বিশ্বাসের। ধরাবাঁধা সময় নেই। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে। আমি যেদিন যেদিন কলকাতার বাইরে যাব, যেতে হবে। ঘড়ি দেখলে কিন্তু হবে না। তবে সানডে ছুটি পাবে। পুজোতেও চারদিন ছুটি। পারবে?"

এই রে, সময়ের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই! এমন কাজ! মাকে তা হলে একা থাকতে হবে? পাশের ঘরের সরলামাসিরা সাহায্য করে। বাবুর বোন মিনুও আসে। কিন্তু তারাই-বা কত করবে? এমনি তো মা ঠিকই থাকে। কিন্তু মায়ের ওই ভয়ংকর সময়গুলোয় যে কী হবে!

বিজনকে ভাল করে দেখল নমন। মুখটা চৌকো। কপালে ভাঁজ। মুখের রং পুড়ে গিয়েছে। কী করতে হবে ওকে? কিন্তু এত ভাবলে কি হবে! কাজটা দরকার যে!

বিজন হাসল এবার। বলল, "শোনো, দশ হাজার দেব আমি। সঙ্গে খাওয়া। মানে সারা দিনের যা খাওয়াদাওয়া আমার কাছেই করবে। পুজোয় বোনাস পাবে। এখন বলো। করবে?"

নমন বুঝতে পারল না কী বলবে।

বিজন আবার বলল, "শোভনবাবুর সঙ্গে আমাদের কাজ হচ্ছে বছর দুয়েক। শোভনবাবুর বন্ধু যখন রেকমেন্ড করেছেন, তখন তো তোমাকে বিশ্বাস করাই যায়, তাই না? ইউ সিম টু বি অ্যান অনেস্ট গাই! তা ছাড়া আমাকে কেউ ঘাঁটায় না! বুঝেছ তো?"

শেষের কথাটার মধ্যে একটা লুকিয়ে থাকা থ্রেট আছে, বুঝল নমন। তবে ও আর কিছু ভাবল না। ভিখিরির আবার পছন্দ! ও বলল, "হ্যাঁ স্যার, আমার অসুবিধে নেই।"

বিজন জামার বুকপকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, "কাল চলে এসো এখানে। সকাল ন'টায়। দেরি কোরো না কিন্তু। কেমন?"

নমন উঠে দাঁড়াল। তারপর দু'জনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ভাল লাগছে বেশ। এভাবে যে চাকরি পেয়ে যাবে একবার এসেই, সেটা ভাবতে পারেনি। হাজার দশেক টাকা সেরকম কিছু নয়। কিন্তু তাও কিছু তো বটেই। মাসে আঁকা শিখিয়ে আর বয়স্ক মানুষদের বাড়ির ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে, ওষুধ কিনে দিয়ে মোট হাজার ছয়েক মতো হত। সেই তুলনায় চার হাজার বেশি পাবে। এটাই অনেক। তবে চাকরিটা ধরে রাখতে হবে ওকে। দোকানটার তো আর আশা নেই। সামনের মাসের মধ্যে কী করে আর পারবে অত টাকা জোগাড় করতে! চাকরিটাই এখন ভরসা।

অফিস থেকে বেরিয়ে বাইরে আসতেই গরমের একটা হলকা লাগল। তবে পাত্তা দিল না নমন। মনটা ভাল আছে। ওর মনে হল খবরটা সবার আগে কাকে দেবে? বাবুকে নাকি ইলাক্ষীকে?

বাবু নমনের ছোটবেলার বন্ধু। ওদের পাড়ায় থাকে। বাবুর একটা জেরক্সের দোকান আছে। সঙ্গে টুকটাক পেন পেনসিলের স্টেশনারি রাখে। বাবুর জীবনে ওই দোকান আর ফুটবল ছাড়া কিছু নেই। অনেক কঠিন সময়ে বাবু টাকা দিতে না-পারলেও, পাশে থেকে সাহায্য করে নমনকে। ওর বোন মিনু অনেক করে মায়ের জন্য। কিন্তু নমনের কাছে ইলাক্ষীই আসল। মানে ভাল কিছু হলে ইলাক্ষীকে সেটা বলতে না-পারা অবধি নমন যেন শান্তি পায় না। তাই ও ঠিক করল খবরটা আগে ইলাক্ষীকেই দিতে হবে।

গত বছর একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করেছিল নমন। সাত দিনের কাজ ছিল সেটা। সেখানেই আলাপ হয়েছিল ইলাক্ষীর সঙ্গে।

একটা ফিল্মের প্রাইজ গিভিং সেরেমনি ছিল। তাতে শুট করার ব্যাপার ছিল। সেখানে চার-পাঁচজন মডেলের সঙ্গে ইলাক্ষীও এসেছিল। নমনের কাজ ছিল, এই মডেলদের সকলকে একটা বড় গাড়ি করে পিক আপ করে আনা, সারা দিন রিহার্সালে দেখাশোনা করা, তারপর রাতে বাড়িতে ড্রপ করে দেওয়া।

সেখানেই ইলাক্ষীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সব মেয়েদের মধ্যে ইলাক্ষীই একমাত্র ছিল, যে ভাল করে কথা বলত ওর সঙ্গে। বলত, "আমায় ইলা বলে ডেকো তুমি।"

নমন জানে, গরিবের ঘোড়ারোগ হতে নেই। কিন্তু তাও ইলাকে দেখে, ওর কথাবার্তা শুনে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল মনটা। কাজের শেষ দিন, কাল থেকে ইলাকে আর দেখতে পাবে না বলে, মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। মনে হচ্ছিল বুকের ভেতরে পাথর গড়িয়ে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে সব। ওর বুকের মধ্যে যে এত পাথর আর এমন গভীর খাদ ছিল, এর আগে কোনওদিন বুঝতে পারেনি ও।

কী করলে যে শান্তি পাবে বুঝতে পারছিল না নমন। মনে হচ্ছিল ওই তো এত কাছে আছে মেয়েটা, কিন্তু তাও যেন নেই!

শেষে আর পারেনি নিজেকে আটকাতে। ভয় আর লজ্জার পাঁচিল টপকে ইলাকে বলেছিল, "আমার কাছে তো তোমার নাম্বার আছে। আমি কি তোমায় মাঝে মাঝে মেসেজ করতে পারি?"

ইলা তাকিয়েছিল। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছিল নমনের। না করে দেবে না তো? অপমান করবে না তো? অবজ্ঞা করে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে না তো?

ইলা হেসেছিল। তারপর খুব ক্যাজুয়ালি বলেছিল, "করবে। জিজ্ঞেস করার কী আছে!"

সেই কথা শুরু হয়েছিল দু'জনের। আর এই দু'বছরে ইলার সঙ্গে যোগাযোগও বেড়েছে। কিন্তু না, যেটা চেয়েছে সেটা হয়নি। ইলা ওকে বন্ধু হিসেবেই দেখে, তার বেশি নয়।

নমনের কষ্ট হয় খুব। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। বললে যদি এই যোগাযোগটুকুও চলে যায়!

আজ ইলা পার্ক স্ট্রিটেরই একটা দোকানে এসেছে শুট করতে। ভালই হয়েছে। ওকেই প্রথম দেবে চাকরি পাওয়ার খবরটা।

দোকানটা আইসক্রিমের দোকান। ওদের বিজ্ঞাপনের শুট চলছে। খুব কিছু বড় ব্র্যান্ড নয়। আসলে ইলা চায় সিনেমায় নায়িকা হতে। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না ঠিক। তাই বিজ্ঞাপনের যা কাজ পায় করে।

ইলা দোকানের মধ্যেই বসে ছিল। বাইরে থেকে দেখতে পেল নমন। কিন্তু নমনকে প্রথমে দোকানে ঢুকতে দিচ্ছিল না। নমন দোকানের বাইরে থেকে হাত তুলে ইলাকে ডাকার পর ঢোকার অনুমতি মিলল।

ইলার মুখটা গম্ভীর। মেক-আপের আড়াল থেকেও কপালের ভাঁজগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল নমন। মনে মনে একটু দমে গেল। ইলা কি বিরক্ত হল?

নমন বলল, "আমি একটা খবর দেব বলে এলাম। আসলে আমি চাকরি পেয়েছি। এই মাত্র কনফার্ম হল। জানতাম এখানে আছ তুমি... তাই মানে এলাম আর কী জানাতে।"

"বাহ," ইলা সামান্য হাসল। তারপর বলল, "আসলে আমার না এখন টাইম নেই!"

নমন বুঝল হাসিটা কৃত্রিম। ও বলল, "ভদ্রলোকের অনেক ব্যবসা। চালের কল..."

"ওকে ওকে কনগ্র্যাচুলেশনস। পরে কথা বলি?" ইলা যেন ওকে তাড়াতে পারলে বাঁচে।

নমন চোয়াল শক্ত করল। মেয়েটা এমন করছে কেন? ও মনে মনে কয়েক মাস ধরে বুঝতে পারছে যে, ইলা নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছে ওর থেকে। কিন্তু হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু বলতে পারছে না। ওর আজকাল কেমন যেন মনে হচ্ছে ইলা নিজের ধান্দা ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

ইলার বিরক্ত মুখের দিকে তাকাল নমন। তারপর সাবধানে কেটে কেটে বলল, "লোকটার প্রোডাকশন হাউসও আছে!"

ইলা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল। চোখেমুখে কৌতূহল, আগ্রহ।

নমনের বুকের মধ্যে যেন কুট করে একটা পোকা কামড়াল। বিষ! আচমকা এত কষ্ট হল যে, চোয়াল শক্ত করে নিজেকে সামলাল ও।

ইলা হাসল খুব মিষ্টি করে। তারপর বলল, "প্রোডাকশান হাউস! দারুণ তো! খুব ভাল। নমন, আমাকে একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে, প্লিজ?"

নমন উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে ফেলল দ্রুত। তারপর মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দেব।"

ইলা হাসল। নমনকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলল, "ইউ আর আ ডার্লিং। ভুলে যাবে না কিন্তু।"

নমনের মনে হল বরফের তৈরি পুতুল যেন জড়িয়ে ধরেছে ওকে! মানুষ এমনও হয়!

চার

রতিশ জানে, জীবনে ভাল করে বাঁচতে গেলে গলার জোর লাগে। এখন আর সেই সময় নেই, যেখানে কেউ নেকুপুশুমুনু করে থাকবে আর পৃথিবী তাকে ভাল করে থাকতে দেবে। এই আটত্রিশ বছর বয়সে এসে রতিশ সত্যি করে বুঝেছে যে, জোর না খাটালে মুলুক টিকবে না।

এই যে বড় চেম্বারে বসে রয়েছে জিতেশদা। ওদের পার্টির বড় লিডার, মন্ত্রী। চারদিকে এত নাম! সে এমনি এমনি হয়েছে নাকি? পেশির জোর আর বুদ্ধির জোর আছে বলেই না ওই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে। লোকের মাথায় পা না দিলে এই যুগে ওপরে ওঠা যাবে না। জিতেশদা ঠিক সময় ঠিক লোকের মাথায় পা দিয়ে ওপরে উঠেছে। কোনও দয়া দেখায়নি। কোনও লজ্জা দেখায়নি। ওপরে উঠতে গেলে জীবনের বেসিক নিডগুলোকে মানুষ যেভাবে চায়, সেইভাবে চাইতে হবে উন্নতি। না হলে কিছু হবে না।

ওই যে ঘরের কোনার দিকে বসে আছে কানাই সাউ। লোকটা সেই ছোটবেলা থেকে পার্টি করছে। কিন্তু কিছু করতে পেরেছে? কিচ্ছু পারেনি। সারাক্ষণ সকলের জন্য চা এনে, জল এনে, খবর কাগজ এগিয়ে দিয়ে, মিছিলের লোক জড়ো করে, ম্যাটাডোর ভাড়া করে, পতাকা নামিয়ে আর তুলে কাটিয়ে দিল এতগুলো বছর। সকলের সঙ্গে কী সুন্দর নরম করে কথা বলে। মনে হয় গোটা পৃথিবীর লোক যেন কানাইদার মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী এসেছে!

আরে বাবা, দাবড়ে চলতে হয়। কারণ না থাকলেও, ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখ করে থাকতে হয়। অকারণে হ্যা হ্যা করে হাসতে নেই। চেনা লোককেও, 'কে আপনি?' লুক দিয়ে দেখতে হয়। কারও সঙ্গে সহমত পোষণ করতে নেই। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, মানুষজনকে ব্যবহার করে মাটির ভাঁড়ের মতো ছুড়ে ফেলে দিতে হয়। কানাইদা একটা গান্ডু। কিচ্ছু বোঝে না। আরে বাবা, লোকে পার্টি করে কেন? আদর্শের জন্য নাকি? পাগল! পার্টি হল এমন একটা গাছ, যা ঠিকমতো ঝাড়া দিলে টাকা পড়ে। সবটাই তো রোজগার আর প্রতিপত্তি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে নেতারা কী করেছেন, সে সব আর এখন রেলেভেন্ট নয়। এখন আসল হচ্ছে ক্ষমতা আর টাকা। তার জন্য যা করার সব করতে হবে। এ হল যুদ্ধ। কোনও কাজই এতে খারাপ নয়।

এই যে জিতেশদার ঘরে মিস্টার কুলভূষণ বাজাজ বসে আছেন, তিনি কি পার্টির কাজে এসেছেন নাকি?

লোকটা বেহালা অঞ্চলে একটা মাল্টি-স্টোরিড কমপ্লেক্স করে ফেঁসে গিয়েছে। অ্যাপ্রুভড প্ল্যানের বাইরেও কিছু কাজকম্ম করে ফেলেছে। ব্যস, কাজ গিয়েছে আটকে। সেখান থেকে কী করে রেহাই পাওয়া যাবে সেই জন্য বাজাজ ধরেছিল রতিশকে। তা রতিশ বলেছিল, ওর বেশি নয়, লাখ পাঁচেক লাগবে, তা হলে জিতেশদার সঙ্গে সেটিং করিয়ে দেবে। তারপর বাজাজ টাকা দিয়েছে, আর ও সেটিং করিয়ে দিয়েছে। গোটা দেশটাই ছোট ছোট কাউন্টারে ভাগ হয়ে গিয়েছে। টাকা দাও, কাজ নাও।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রতিশ। একটা কাজ আছে। কালিকাপুরের দিকে যেতে হবে। কাজটা ভাল নয়, কিন্তু করা জরুরি। কোনওদিন যায়নি ওখানে ও। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে, যেতেই হবে শেষমেশ।

"একটা সিগারেট দিবি?"

রতিশ তাকিয়ে দেখল কানাইদা এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাকাসে, ছোটখাটো লোক। গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখে কেমন একটা লেজ-নাড়া ভাব। লোকটা যেন দিনকে দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে। রতিশ ভাবল, মালটা চকের তৈরি নাকি?

পকেট থেকে দামি প্যাকেটটা বের করল রতিশ। চারটে আছে এখনও! এক-একটার দাম কুড়ি টাকা। প্যাকেটটা গোটাটাই দিয়ে দিল।

কানাই ঘাবড়ে গেল একটু, "একটা দিলেই হবে।"

"রাখো না শালা!" রতিশ ধ্যাতানি দিল একটা, "সারাক্ষণ মেনিমুখোপনা। দেখলে গা জ্বলে যায়!"

কানাই হাসল। গালি খেয়েও খুশি। হাসি পেল রতিশের। কিন্তু হাসল না। ওই যে সারাক্ষণ একটা বিরক্তির সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখতে হয় মুখে। তবে কানাইদা, জনির মতো ক্ষতিকারক নয়। পার্টিতে এই অঞ্চলে জনি ওর আসল রাইভাল। এক পার্টি করলেও আসলে দু'জনে আদা আর কাঁচকলা।

কানাইদা সিগারেট জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, "কাল মিছিলে যাবি তো?"

"একটুখানি থাকব। তারপর অন্য কাজ আছে। তুমি?" রতিশ জিজ্ঞেস করল।

"আমি তো সকাল থেকে রাত অবধি থাকব। আমি না-থাকলে হবে?" কানাইদা এমন করে বলল, যেন পার্টিটা কানাইদার ভরসায় চলে।

ভাল। মনে মনে হাসল রতিশ। সারা দুপুর পাওয়া যাবে পপিকে।

পপি কানাইদার বউ। বয়সে প্রায় বারো বছরের ছোট কানাইদার চেয়ে। এমনি দেখলে মনে হয় শান্ত। কিন্তু রতিশ জানে কী জিনিস!

দুপুরে সময় পেলেই রতিশকে মেসেজ করে ডেকে পাঠায়। তারপর যা করে! ভাবলেও রতিশের শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। এমন মেয়েকে কি কানাইদা সামলাতে পারে!

কাল দুপুরেও যে ম্যাচ হবে, সেটা ভাল করেই বুঝতে পারল রতিশ। কানাইদাকে দেখে হাসি পেল ওর। দু'কামরার ঘরে থেকে সারা জীবন কেটে গেল লোকটার। পপির মতো মেয়ে ওইটুকু ঘরে থাকে নাকি! উথলে পড়ে যাবে তো! যায়ও।

তবে পপি একটু ঝামেলা করছে আজকাল। খালি চাপ দিচ্ছে ওকে কানাইয়ের থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। আরে বাবা, পপি বোঝে না যে ফুচকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাওয়াই ভাল। বেকার তাকে কেউ ডাইনিং রুমে নিয়ে গিয়ে চারবেলা খায় না।

"জিতেশদার ঘরে কে এসেছে রে?" কানাই আবার জিজ্ঞেস করল।

"তুমি জেনে কী করবে?" রতিশ আবার ধমক দিল।

কানাই থতমত খেল, "না, মানে এমনি আর কী!"

রতিশ বলল, "শোনো, আমি একটু বেরব। কাজ আছে। সেরে আবার আসব এখানে। জিতেশদা কিছু জিজ্ঞেস করলে বোলো, বাড়ির একটা কাজে গিয়েছি। কেমন?"

গত মাসে একটা ভাল বাইক কিনেছে রতিশ। প্রায় সাড়ে আট লাখ পড়েছে। দেখতে দারুণ। শব্দও অমিতাভ বচ্চনের মতো। রাস্তা দিয়ে গেলে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

বাইকে উঠে স্টার্ট দিয়ে কানাইয়ের দিকে তাকাল রতিশ।

কানাই বলল, "আমায় একদিন বাইকটায় চড়াবি?"

রতিশ বলল, "এ আবার কী কথা! চড়বে। চালাবে ইচ্ছে হলে।"

"ওরে বাবা না না," কানাই আঁতকে উঠল, "আমি বলে সাইকেলই চালাতে পারি না।"

রতিশ কিছু বলল না। ভাবল, পপি ঠিকই বলে।

পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে আনোয়ার শাহ মোড়ের দিকে বাইক ছুটিয়ে দিল ও। দুপুর যেন ঝলসে যাচ্ছে চারদিকে। গাড়ি, বাস, অটোতে যেন গিঁট পেকে গিয়েছে গোটা শহরটায়। আর দু'হাত দূরে দূরে সিগনালগুলো যেন আরও সব ঘেঁটে দিচ্ছে।

এসব ঝামেলা ভাল লাগে না। পার্টি অফিসে এসি আছে। দিব্যি সেখানে বসে হয় সিনেমা নয় খেলা কিছু একটা দেখা যেত। কিন্তু তা নয় এখন যাও কালিকাপুর। মেটাও ঝামেলা। সরযু বলে লোকটা যেন আর না আসে ওর কাছে, তার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে আজকেই।

রতিশ থাকে যাদবপুরে। দোতলা পুরনো বাড়ি। বাবা-মা থাকে একতলায় আর দোতলায় ও একা।

রতিশ অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিল। আর সত্যি বলতে কী, ঠিকঠাক চলছিলও সব কিছু। ওর বউ পুনম বিহারের মেয়ে ছিল। প্রেম করেই বিয়ে। ভাল মেয়ে ছিল পুনম। কিন্তু গোলমালটা করে রতিশই। পার্টিতে একটা মেয়ে যোগ দিয়েছিল। নাম স্বপ্না। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। ফরসা, সামান্য মোটা। চোখগুলো বড় বড়। রতিশের ওই চোখ দুটো দেখে কী যে হয়েছিল! মনে হয়েছিল বড় দশ চাকার ট্রাক বসে গেল বুকের মধ্যে।

পরের ছ'মাস পুরো অন্ধের মতো হয়ে গিয়েছিল রতিশ। স্বপ্না ছাড়া আর কিছুই মাথায় ঢুকত না। ভাবতেও পারত না। দু'জনে লুকিয়ে দেখা করতে শুরু করেছিল। নানান হোটেলে থাকতে শুরু করেছিল। এমনকী, বেশ কয়েকবার ফাইভ স্টারেও নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটাকে। ভেবেছিল আর কিছুদিন পরে পুনমকে কাটিয়ে দিয়ে বিয়ে করবে স্বপ্নাকে।

কিন্তু এইসময়ই পরপর দুটো ঘটনা ঘটেছিল। স্বপ্নার জীবনে অন্য একটা ছেলে এসেছিল আর লেকের ধারে রতিশ আর স্বপ্নার ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকার ছবি জনি লোক দিয়ে তুলিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল পুনমকে।

স্বপ্না তো ছেড়ে গিয়েছেই। পুনমও ছেড়ে চলে গিয়েছে রতিশকে। এখন রতিশ একা।

রতিশের বাবা খুব সাত্ত্বিক মানুষ। এত কিছু হওয়ার পরে আর রতিশের সঙ্গে কথা বলেন না। মুখোমুখি দেখা হলেও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

পৃথিবীতে এই লোকটাকেই একমাত্র সমঝে চলে রতিশ। না, বাবা বকেন না। কটু কথা বলেন না। কিন্তু ওই শান্তভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, কথা না-বলার মধ্যে কী যে চাবুক লুকিয়ে আছে, সেটা একমাত্র রতিশ বোঝে। তাই বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, খুব সংযত হয়ে থাকে রতিশ। মদ-টদ খায় না।

ওইসব খাওয়া, বন্ধুদের নিয়ে হুল্লোড় করা আর মেয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আছে লেক গার্ডেন্সের ওই ফ্ল্যাটটা।

বেশ কিছু বছর আগে ওটা ভাড়া নিয়েছিল ও। কোনওরকম কনট্র্যাক্ট হয়নি। বাড়ির তখনকার মালিক লোকটা বড্ড সরল ছিলেন। সে আর নেই। তাঁর ছেলের বউ না নাতনি কাকে যেন দিয়ে গিয়েছেন বাড়ি।

একামানুষ, নিরীহ, বয়স্ক। এটা বুঝতে পেরে রতিশ ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। একদিন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, রতিশ বলে দিয়েছে যে ফ্ল্যাট ছাড়বে না। ভাড়াও দেবে না। যা খুশি করে নিতে পারেন। পার্টির লোক ও। সেটা যেন মাথায় রাখেন।

মহিলা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন! আর আসেননি। রতিশ ভেবেছিল, মজাই হল। ফোকটেই একটা ফ্ল্যাট দখল হয়ে গেল। এসব না-করতে পারলে বেকার এতদিন ধরে পার্টি করল কেন! জনি এমন কম ফ্ল্যাট দখল করে বসে আছে?

এতদিন ব্যাপারটা ঠিকই ছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে একজন এসেছিল ওর ফ্ল্যাটে। লম্বা শান্ত দেখতে একটা লোক। নাম সরযুনাথ। বাড়িওয়ালি মহিলার নাকি ভাই হয়।

লোকটাকে দেখে খুব বিরক্ত হয়েছিল রতিশ। ঘরেও ঢুকতে বলেনি। দরজা থেকেই জিজ্ঞেস করেছিল, "কী চাই আপনার?"

সরযু বলেছিল, "আমার দিদির ফ্ল্যাট এটা। বহুদিন হল দখল করে আছেন। আপনাকে উঠে যেতে বলা হয়েছে, আপনি শুনছেন না। কোনও পেপার্স নেই আপনার। তাও জবরদখল করে আছেন। এটা তো ঠিক নয়। আমি জানতে এসেছি কবে আপনি উঠবেন?"

রতিশ হেসেছিল। তাচ্ছিল্যের হাসি। বলেছিল, "কে আপনি? ফুটুন তো! ফালতু দুপুরবেলা এসে ঝামেলা করছেন!"

সরযু বলেছিল, "আমি ভদ্রভাবে বলছি। আমার দিদি তার মেয়েকে নিয়ে থাকে। হাজব্যান্ড নেই। ওদের ফ্ল্যাটটা দরকার। আপনি ভালভাবে ছেড়ে দিন। তা হলেই তো হয়। কেন এমন গায়ের জোর দেখাচ্ছেন?"

রতিশ হেসেছিল, "গায়ের জোর আছে তাই দেখাচ্ছি। আমায় ওসব হাজব্যান্ড নেই-টেই বলে সেন্টু দিয়ে লাভ নেই। আমি ওতে গলি না। আপনার যা করার করে নিন। আমিও যা করার করব। বাড়ি ছেড়ে দিন বললেই হল?"

সরযু বলেছিল, "ঠিক আছে আমি দেখছি তবে।"

"কেস করবেন? করুন। এ দেশে কেস করলে কী হয় জানেন তো?"

সরযু আর কিছু বলেনি। চলে গিয়েছিল।

রতিশ জানে, এই চলে যাওয়া কিন্তু একেবারে চলে যাওয়া নয়। সরযু শান্ত মানুষ। কিন্তু ভেতরে একটা চাপা জেদ আছে। লোকটার চোখ দেখেই ও বুঝেছে। তাই এটাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা দরকার।

রতিশের একটা চামচা আছে। বুচা। ওকে দিয়ে রতিশ এটা-ওটা করায়। বুচাকে ও লাগিয়েছিল সরযুর সম্বন্ধে খবর নিতে।

কাল রাতে বুচা এসে খবর দিয়েছিল। সরযু লোকটা এতদিন বিদেশে ছিল। এখানে ছুটিতে এসেছে। বিয়ে-শাদি করেনি। দুপুরবেলা করে বাড়ি থাকে না।

এই দুপুরটাই আসল সময়। রতিশ ভেবেছে ওদের বাড়িতে গিয়ে দিদিটিকে একটু কড়কে দিতে হবে। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখনকার দিনে সবাইকেই পকেটে একটা অদৃশ্য রেঞ্চ নিয়ে ঘুরতে হয়। মাঝে মাঝেই তো কাউকে না-কাউকে টাইট দিতে হয়।

বুচার বলে দেওয়া বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা দাঁড় করাল রতিশ। পাড়াটা বেশ নির্জন। নতুন ফ্ল্যাট উঠেছে কয়েকটা। তবে তার মধ্যেও একটা বিশাল বড় বাড়ি চোখে পড়ল ওর। ইয়াব্বড় গেট। পাঁচিল। ওরে বাবা! কলকাতায় এখনও এমন বাড়ি রয়ে গিয়েছে! প্রোমোটারদের চোখে পড়েনি? দেখে মনে হচ্ছে অনেক জায়গা আছে ভেতরে।

রতিশ ভাবল, এই বাড়িটার কথা বাজাজকে বলতে হবে। বাড়ির মালিককে নরমে গরমে বশ করে জায়গাটা পেলে ভাল, একটা লাক্সারি কমপ্লেক্স হতে পারে। রতিশের পকেটে অনেক টাকা এসে যাবে।

তবে আগের কাজ আগে করতে হবে।

বাইকের চাবি পকেটে পুরে ইটরঙা বাড়িটার দিকে এগোল রতিশ। একতলায় থাকে ওই মহিলা। বুচা এটাও জেনে এসেছে।

কলিংবেল টিপে পেছনের পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে শুরু করল রতিশ। এটা ওর স্টাইল। ও খুব কুল আর ক্যাজুয়াল থাকে এসব থ্রেট-টেট করার কাজে এসে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে এমন করে কথা বলে যে, অপর পক্ষ ঘাবড়ে যায়।

"কে?" ভেতর থেকে একটি মহিলাকণ্ঠ ভেসে এল।

রতিশ কর্কশভাবে বলল, "খোল দরজা, দরজা খোল," বলে জোরে জোরে কয়েকবার দরজায় ধাক্কা মারল।

মহিলাকণ্ঠ ওদিক থেকে বলল, "আস্তে আস্তে। আরে, দরজা ভাঙবেন নাকি?"

"খোল বলছি," রতিশ আরও কর্কশ গলায় বলল। তারপর আবার দরজায় ধাক্কা মারতে গেল, কিন্তু এবার দরজাটা খুলে গেল আচমকা। একটা অল্পবয়সি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। ভুরু কোঁচকানো। মুখ সামান্য লাল। বিশাল বড় দু'জোড়া চোখ ওর ওপর স্থির।

থমকে গেল রতিশ। হাতের চিরুনি স্থির হয়ে গেল। কে মেয়েটা! এমন চোখ দিয়ে কেন এসব মেয়েদের পৃথিবীতে পাঠায় ভগবান!

না, ভগবানে বিশ্বাস নেই রতিশের। কিন্তু আজ, এক মুহূর্তের জন্য হলেও ওর মনে হল, শিয়োর আকাশের ওই নীল চাদরের ওদিকে কেউ একজন আছেই, না-হলে কেন বারবার ওর দিকে তাক করে এমন চোখের মেয়েদের ছুড়ে মারা হয়!

রতিশ বুঝল, আবার সেই দশ চাকার ট্রাকটা ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে ওর বুকের মধ্যে।

পাঁচ

অন্য ঘর থেকে ঝনঝন করে কিছু একটা ভাঙার শব্দ এল। মুখ ঘুরিয়ে দেখল ইলা। আজ সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে চোখ গেল ওর। সওয়া দশটা বাজে। এতক্ষণে ওর বড় রাস্তার মোড়ে থাকার কথা ছিল। কিন্তু কী করবে! বাড়িতে মায়ের শরীরটা আজ ভাল নেই। অফিস যেতে পারেনি। সকালে রান্নাও করতে পারেনি। ওকেই যা করার করতে হয়েছে। তারপর স্নান সেরে, পুজো করে খেয়ে, ড্রেস আর মেকআপ করে বেরতে সময় তো লাগবেই।

তা ছাড়া কাল অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছিল ও। শুট ছিল একটা। আইসক্রিম ব্র্যান্ডের। তেমন বড় কিছু নয়। তাও তিনদিনের কাজ। গতকালই ছিল শেষ দিন। শুট শেষ হতে হতে রাত আটটা বেজে গিয়েছিল। ক্লান্ত লাগলেও ইলার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। তাই কাছেই একটা বারে গিয়েছিল ওরা কয়েকজন। কয়েকজন মানে পলা, স্যান্ডি, অপু আর জনিদা। জনিদাই ট্রিট দিয়েছিল ওদের। এমন গ্যাদারিংয়ে জনিদাই সচরাচর ট্রিট দেয়। তা জনিদা দিতেই পারে। টাকা কি কম আছে নাকি! পলিটিক্স করে। শুনছে পরের বার ভোটে এমআইসি হতে পারে। মানে যদি টিকিট পায়। পার্টির মধ্যেই রতিশ না কে একটা লোক আছে, তার সঙ্গেই নাকি মূল রাইভালরি জনিদার। রতিশ নাকি সারাক্ষণ নানাভাবে জনিদার ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

এসব শুনতে ভাল লাগে না ইলার। কিন্তু কী করবে, শুনতে হয়। জনিদার টাকায় ফুর্তি করবে আর তার কথা শুনবে না, তা তো সম্ভব নয়।

তবে ইলা সব যে শোনে তা নয়। শোনার ভান করে। ভান করতে ওর মতো আর কেউ পারে না। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক এখনকার পৃথিবীতে। নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য তো আনস্ক্রুপুলাস হতেই হয়, তার ফলে যেখানে কেয়ার করার ভান করতে হয়, সেখানে সেটা করে। যেখানে প্রেম-প্রেম ভান করতে হয় সেখানেও সেটাই করে। ফালতু ইমোশন দেখিয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া কিছু বোকা গাধা তো রয়েইছে পৃথিবীতে। যারা এসব ভান বোঝে না। তাদের ধরে ধরে বোকা বানানো বা চলতি কথায় বলতে গেলে 'মুরগি' করা তো সবচেয়ে সোজা। ইলা এসব পারে করতে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ও অন্য লেভেল অবধি যেতে পারে। কিন্তু এখনও যেটা পারেনি সেটা হল শুয়ে পড়া।

অনেক মানুষবেশী রাক্ষস আছে যারা কাজ দেওয়ার বিনিময়ে শুতে চায়। কিন্তু ইলা জানে, একবার শুয়ে পড়লে তারা আর কাজ দেবে না। বা দিলেও সেটা এমন ছোট আর ফালতু কোনও রোল হবে যে, কেরিয়ার শুরুর আগেই তা শেষ হয়ে যাবে। তাই সেইসব চক্করে পড়ে না ও।

জনিদা অবশ্য প্রথমেই বলে দিয়েছিল যে, ওর কিন্তু এসব ফিল্ম লাইনে কোনও ইনফ্লুয়েন্স নেই। তাই ও কোনও হেল্প করতে পারবে না। সুতরাং জনিদাকে বলে কিছু লাভ হবে না, ইলা বোঝে। জনিদা মাঝে মাঝে এসব ট্রিটের জন্য, আড্ডার জন্য ঠিক আছে।

কাল অনেক রাতে বার থেকে বেরিয়েছিল ও। ক্যাব বুক করে বাড়ি ফিরতে প্রায় দেড়টা বেজে গিয়েছিল। এসে দেখেছিল বাবা ঘুমিয়ে আছে। মা জেগে থাকলেও জ্বর।

মা শুধু বলেছিল, "এত রাত করিস না। জানিসই তো তোর বাবা কেমন করে!"

বাবা তো সারাক্ষণই এমন করে। সেই দশ বছর আগে দিদি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তো বাবা কেমন হয়ে গিয়েছে। সারাক্ষণ মদ খেয়ে বসে থাকে। মাকে মাঝে মাঝে মারে। কাঁদে একা একা। আচমকা মাঝরাতে নিজের মারা যাওয়া মা-বাবাকে উদ্দেশ করে খারাপ খারাপ গালাগালি করে।

পাড়ার লোকজন বেশ কয়েকবার এসে বাড়িতে ঝামেলা করেছে। এত অশ্লীল কথা সারা রাত ধরে কেউ যদি চিৎকার করে বলে, তা হলে তো রাগ হবেই। সকলেরই তো বাড়িতে বাচ্চাকাচ্চা আছে!

তা ছাড়া বাইরে থেকে মদ খেয়ে আসতে গিয়েও বাবা দু'-একবার মার খেয়ে চোখমুখ ফুলিয়ে, জামাকাপড় ছিঁড়ে বাড়ি এসেছে। তবে খুব খারাপ ঘটনা হয়েছিল মাস দেড়েক আগে।

পাড়ার রিকশাওয়ালারা এসে খবর দিয়েছিল যে, ওর বাবা মোড়ের কাছে নাকি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

মা আর ইলা গিয়েছিল দৌড়ে। দেখেছিল, বাবা উপুড় হয়ে আছে। মুখের কাছে বমি ছড়িয়ে রয়েছে। কিছু বমি মুখের পাশে লেগে রয়েছে শুকিয়ে। প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলায় প্যান্ট ভিজে।

ইলার সেদিন অপমানে, কষ্টে, রাগে চোখে জল এসে গিয়েছিল। সবাই তাকিয়ে দেখছিল ওদের। না, কেউ হাসছিল না। কিন্তু সেই তাকিয়ে থাকার মধ্যে এমন হুল ছিল যে, নিতে পারছিল না ইলা। খালি মনে হচ্ছিল কতক্ষণে বাড়ি যাবে।

পাড়ারই কয়েকজনের সাহায্যে বাবাকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল ওরা। ভাল করে পরিষ্কার করিয়ে, স্নান করিয়ে বাবাকে শুইয়ে দিয়েছিল বিছানায়। এর পরের দু'দিন ভাল ছিল বাবা। ভাল মানে চুপচাপ ছিল। তারপর আবার যেই কে সেই!

মাঝে মাঝে এত ক্লান্ত লাগে ইলার। মনে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে পারে না। বাবা ভাল চাকরি করত। পেনশন আসে ভাল। মায়ের রোজগার আছে। বাড়িও নিজেদের। বাইরে থেকে দেখতে গেলে কোনও অসুবিধে থাকার কথা নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু ইলা জানে, রোজ কী যন্ত্রণা নিয়ে ওকে বেঁচে থাকতে হয়।

আজ সকাল থেকে বাবা আবার শুরু করেছে। সাতসকালেই একগলা মদ খেয়েছে। তারপর আজেবাজে কথা শুরু করেছে। তবে ইলা জানে এসব বেশিক্ষণ চলবে না। একটু পরেই থেমে যাবে। কারণ, বাবা ঘুমিয়ে পড়বে।

মা অফিস গেলে বেঁচে যায়। কিন্তু মা আজ অফিস যায়নি। ফলে সারা দিন মাকে সহ্য করতে হবে এইসব। বাবা ঘুম থেকে উঠেই তো আবার এসব শুরু করবে।

মাঝে মাঝে ইলা মাকে বলে, কেন মা ডিভোর্স নিয়ে নেয় না! কিন্তু মা শুনবে না। সেই যে প্রেম করে বিয়ে করেছিল। সেই যে ভালবাসা। লাভ! ইলার ঘেন্না ধরে গিয়েছে ভালবাসায়। লাভ! চার অক্ষরের শব্দ। সত্যি, লাভ ইজ আ 'ফোর' লেটার ফাক!

ইলা ওইসব লাভে-টাভে পড়ে না। তবে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য অন্যকে নিজের প্রেমে পড়ায়। পলা বলে, "ভালই ফাঁসাতে পারিস! আগের জন্মে ফাঁসুড়ে ছিলি নাকি রে?"

ইলা জানে ওকে ওর লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। সিনেমার নামী হিরোইন ওকে হতেই হবে।

বিছানার ওপর থেকে মোবাইলটা তুলল ইলা। রাতে চার্জ দিয়েছিল। কিন্তু এখনই কুড়ি পারসেন্ট কমে গিয়েছে ব্যাটারি। ফোন পুরনো হলে এত দ্রুত চার্জ পড়ে যায়!

একটা নতুন ফোন কিনতে হবে। ওই যেমন অনেকে কিনছে, তিনটে ক্যামেরাওয়ালা। কিন্তু এখন হাতে সেভাবে টাকা নেই। লাস্ট বিজ্ঞাপনের কাজে খুব বেশি কিছু দেয়নি। ফলে ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

মোবাইলের সঙ্গে চার্জারটা নিয়ে নিল হাতের ব্যাগে। একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক কিনলে ঝামেলা মিটে যায়। কিন্তু সেটা কেনার মতো টাকাও ওর হাতে নেই। আর মায়ের কাছে চাওয়ার প্রশ্নই নেই।

পড়াশোনায় দিদি মানে নীলাক্ষীর মতো ভাল ছিল না ও। কিন্তু ছোট থেকেই অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। ক্লাস ইলেভেনেই ঠিক করে নিয়েছিল এই নিয়েই কিছু একটা করবে।

তাই তখন থেকেই মডেল হান্ট থেকে শুরু করে নানান বিউটি প্যাজেন্টে নাম দিয়েছে ইলা। অভিনয় শেখার স্কুলেও ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, একটা জিনিস ও বুঝেছে। এখানে একটা অদৃশ্য বলয় আছে। সেটাকে সবাই ভেদ করতে পারে না। সবাই গলা শুকোয় নতুন কেউ নেই, নতুন কেউ আসছে না বলে। কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি নতুন কাউকে সেভাবে কিন্তু সুযোগ দেওয়া হয় না। ও বোঝে এই পৃথিবীটাই হল ওর মতো। সবাই ভানের ওপর নির্ভর করে চলছে।

ঘরের থেকে বেরল ইলা। ওই ঘরে কিছু একটা ভেঙেছে বাবা। মা এই শরীর নিয়েও গিয়েছে সেসব পরিষ্কার করতে। আর বাবা জড়ানো গলায় কীসব যেন বলে যাচ্ছে মাকে।

মাঝে মাঝে ইলার মনে হয় বাবাকে বাবা হিসেবে ভুলে গিয়ে একদিন খুব পেটায়। হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে পেটায়।

আরে বাবা, দিদি যদি কাউকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়, তা হলে তুমি বাধ সেধেছিলে কেন? তারপর যখন দিদি পালাল, তখন দোষ পড়ল মায়ের ওপর? কী এমন করেছে মা? মা নিজের কাজ করবে নাকি মেয়ের পেছনে ঘুরে ঘুরে দেখবে সে কার সঙ্গে কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে!

দিদি কোথায় আছে সেটা মা আর ও জানে। কিন্তু বাবাকে জানায় না। কারণ, জানলে বাবা হয়তো চলে যাবে সেখানে। হয়তো সেখানে গিয়েও সিন ক্রিয়েট করবে।

দিদিও ভয় পায়। বলে, "বাবাকে বলিস না ইলা। এখানে এসে কী যে করবে কে জানে!"

জামাইবাবু শীতলদা একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে। দিদিও চাকরি করত, কিন্তু ছেলে হওয়ার পরে আপাতত ঘরেই আছে। কসবার কাছে ওদের ছোট্ট ফ্ল্যাট। সাড়ে ছ'শো স্কোয়্যার ফিট। কিন্তু ছোট হলেও ওরা শান্তিতে আছে। দেখে ভাল লাগে ইলার।

দিদি চিরকাল বাবার খুব বাধ্য ছিল। বাবা চেয়েছিল দিদি ডাক্তার হোক। আর জয়েন্টে চান্সও পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এক বছর পড়ার পরেই প্রেম আর তারপরের এইসব ঝামেলা হয়ে যায়।

ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়েছিল দিদি। বিয়ের পর ডিসট্যান্সে শুধু গ্র্যাজুয়েশন করেছে।

বাবা এটাই মেনে নিতে পারেনি। একদম পালটে গিয়েছে। ইলা ভাবে, কোন মানুষের যে কীসে কখন ব্যালেন্স হারিয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না।

"মা," বাবার ঘরের বাইরে থেকে ডাকল ইলা।

"দাঁড়া আসছি," মা উত্তর দিল।

"কে এসেছে? আবার ও এসেছে? কেন ডাকছে তোমায়? কী চায়?" বাবা জড়ানো গলায় বলল।

মা এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

ইলা বলল, "আমি বেরচ্ছি। তুমি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ো।"

"আয়," মা আর কিছু বলল না।

ইলাও আর দাঁড়াল না। দরজার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে শুনল বাবা বলছে, "কী? মেয়ে আবার রাস্তায় দাঁড়াতে গেল তো! বড় মেয়েটাকেও শিখিয়েছিলে আর এখন ছোটটাও শিখে ফেলেছে। কী রক্ত আছে তোমার গায়ে? কী রক্ত!"

রাস্তায় বেরিয়ে যেন স্বস্তি পেল ইলা। নরকে থাকে ও। ভগবান শত্রুকেও যেন এমন নরকে না-পাঠায়! খুব খারাপ লাগলেও একটা সত্যি ও বুঝে গিয়েছে। বাবা না-মরলে ও বা মা কেউ শান্তি পাবে না।

ব্যাগের মধ্যে মোবাইলটা নড়ে উঠল এবার। নিশ্চয় নমন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে ছেলেটা। হয়তো সেইজন্যই ফোন করছে। নমনকে সারাক্ষণ একটা দূরত্বে রেখে দেয় ইলা। কাজের ছেলে আছে নমন। অনেক কিছু করে দেয়। কিন্তু তাই বলে নমন যা চায় সেটা ইলা ওকে দেয় না। মানে, কেন দেবে? ইলা তো ওর জন্য কিছু 'ফিল' করে না! কিন্তু তাও একেবারে ছেড়েও দেয় না। ওই প্লুটোর মতো ওকে রেখে দেয়।

নমনও যেন তাতেই খুশি। বোকা ছেলে। কিছুই বোঝে না ও। গবেট একটা।

ইলার শুধু ভাবলে একটু খারাপ লাগে যে, নমনকে যেদিন ও ছেঁটে ফেলে দেবে, সেদিন ছেলেটা কষ্ট পাবে। যাক গে, যে যা খুশি পাক, ওর তাতে কী! কেউ বোকা হলে লোকে তো তার সুবিধে নেবেই।

পলা বলে, "বোকা? ভাল নয়? কেউ তোর জন্য ভালবেসে কিছু করছে আর সেটাকে তুই বোকামো ভাবছিস! ওকে এক্সপ্লয়েট করছিস! এটা ঠিক?"

পলাকে বলে লাভ নেই। ও নিজে জন্ম রোম্যান্টিক। সেই ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় থেকে একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করে। দশ বছর হয়ে গেল। ছেলেটা তেমন কিছুই করে না। পলাই বলতে গেলে হাতখরচ জোগায়। দায়ে দফায় ছেলেটার বাড়িতেও টাকাপয়সা দেয়। বোকা মেয়ে।

ইলার সোজা হিসেব। নায়িকা হিসেবে সিনেমা করবে। নাম করবে, টাকা করবে। তারপর ঠিক সময়ে মালদার কোনও ছেলে দেখে ঝুলে পড়বে। সারা জীবন যাতে রানির মতো থাকতে পারে সেটা নিশ্চিত করে নেবে। কে ফালতু প্রেমের চক্করে পড়বে!

ফোনটা বের করে ধরল ইলা। বিরক্ত গলায় বলল, "কী হল?"

নমন সামান্য থমকাল। তারপর বলল, "না, মানে স্যার এসে গিয়েছেন। তাই..."

এই রে! বিজনবাবু চলে এসেছেন! ইলা দ্রুত মনে মনে কী বলব ঠিক করে নিল। তারপর গলাটা সামান্য করুণ করে বলল, "মা খুব অসুস্থ। মাকে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এই বেরলাম। কিছু খাওয়াও

হয়নি। তুমি একটু ওঁকে বলো যে, আমি দু'মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছি!"

"ঠিক আছে। ধীরেসুস্থে এসো। আমি বলছি," নমন ফোনটা কেটে দিল।

বিজন দাসের কথা ওকে বলেছিল নমন। লোকটা প্রোডিউসার। ইতিমধ্যেই পাঁচ-ছ'টা সিনেমা করে ফেলেছে। সামনে নাকি আরও দুটোর কথা চলছে। লোকটাকে ইমপ্রেস করতে পারলে আর দেখতে হবে না। কপাল খুলে যাবে।

নমন ফোনে কথাও বলিয়ে দিয়েছে বিজনবাবুর সঙ্গে। খুব মার্জিত কথাবার্তা। বলেছিল আজ দেখা করতে। নিজেই নাকি পিকআপ করে নেবে। আর সেখানেই দেরি হয়ে গেল।

জোরে বড়রাস্তার দিকে পা চালাল ইলা।

গাড়িটা বেশ বড়। কালো রঙের। সামনের সিটে ড্রাইভারের সঙ্গে বসে আছে বিজন। টাক মাথা। চাপ দাড়ি। চোখে সানগ্লাস। বছর পঞ্চাশেক বয়স।

ওকে দেখে নমন তো নেমেই ছিল পেছনের সিট থেকে। বিজন নিজেও নামল। মুখে হাসি।

ইলা হেসে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াল। বিজন হাত ধরল না। জোড় হাত করে নমস্কার করে বলল, "আপনার মা এখন কি একটু বেটার? মানে আজ তেমন সমস্যা হলে পরে একদিন আমরা দেখা করতে পারি। কেমন?"

"না না স্যার, আজ ঠিক আছে," ইলা হাসল, "কাজ আগে। আই অ্যাম কমপ্লিটলি ডেডিকেটেড টু মাই ওয়র্ক। আর আপনি আমায় তুমি করে বলবেন, প্লিজ।"

"ভেরি ওয়েল," বিজন হাসল।

নমন নিজে সামনের সিটে বসতে গেল। বিজন বাধা দিল, বলল, "না, তুমি আর ইলাক্ষী পেছনের সিটে বোসো। আমি সামনে ঠিক আছি।"

ইলা সামান্য অবাক হল। নতুন মেয়ের পাশে সাধারণত এমন অবস্থায় বসতে চায় এইসব লোকজন।

বিজন হয়তো বুঝল। বলল, "দ্যাখো ইলাক্ষী, আমরা এখানে প্রফেশনালস। আমি বিজনেস বুঝি। আমায় নমন বলেছে তোমায় কাজ দেওয়ার কথা। আমি নতুনদের মানে স্পেশ্যালি ইয়ংদের চান্স দিই। নমনকেও দিয়েছি। আমি গাট ফিলিং নিয়ে চলি। আই বেট অন নিউ পিপল। কিন্তু আমি এটুকুই পারি। কাজটা আমার হাতে নেই। আমার ডিরেক্টর, মিতুল তোমায় দেখে 'ওকে' করলে তুমি কাজ পাবে। না-হলে নয়। বুঝেছ? আমাদের মধ্যে সবটুকু প্রফেশনাল থাকবে। বিজনেস থাকবে। কেমন?"

ইলার ভাল লাগল খুব। যাক। এই লোকটা ওই নোংরা পিশাচগুলোর মতো নয়। এখানে যদি ভাল কিছু একটা হয়ে যায়, তা হলে নমনকে এবার ছেঁটে ফেলে দেবে। মনে মনে ঠিক করে নিল ইলা।

বিজন গাড়িতে উঠে গেল। ইলা তাকাল নমনের দিকে। দেখল, ও গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে ইলা উঠবে বলে। ইলার হাসি পেল। দরোয়ানের কাজ করছে এখন। আর সে কিনা স্বপ্ন দেখে ওকে নিয়ে! কুঁজোরও শখ হয় চিত হয়ে শোওয়ার!

হাসি চেপে গাড়িতে উঠল ইলা।

ছয়

ডিসান মোড়ে এলে নমনের মনে হয় কলকাতার অন্যতম নার্ভ সেন্টার যেন এটা। একবার এখানে জট লেগে গেলে কলকাতার একটা দিক প্যারালিসিস হয়ে যাবে।

সামনেই একটা বড় বিল্ডিং। তার মাথায় একটা ডিজিটাল ঘড়ি লাগানো রয়েছে। সেখানে দেখতে পাচ্ছে রাত সাড়ে আটটা বাজে। ক'টায় ছুটি হবে কে জানে! মায়ের জন্য একটা ওষুধ কিনতে হবে। পাড়ার ওষুধের দোকানের বিশুদাকে বলে এসেছিল ওষুধের ব্যাপারে। বলে এসেছিল বিশুদা যেন আনিয়ে রাখে। দোকানে ভিড় ছিল। কাস্টমার সামলাতে সামলাতে মাথা নেড়েছিল বিশুদা। কে জানে ঠিকমতো শুনেছে কি না। দায়টা যখন ওর তখন ওকেই তো ব্যাপারটা দেখতে হবে।

বিকেলে এই নিয়ে বাবুকে ফোন করে দিয়েছিল নমন। বাবু বলেছিল, "চিন্তা করিস না। আমি ঠিক নিয়ে নেব। ম্যাচ দেখে ফেরার পথে বিশুদার দোকানে যাব।"

ম্যাচ, মানে ফুটবল ম্যাচ। লিগের খেলা। ওয়েসিস এবার লিগে দু'নম্বরে আছে। আর এক নম্বরে নর্থ গার্ডেন ক্লাব। আজ দু'জনের খেলা ছিল সল্ট লেক স্টেডিয়ামে। ডার্বি ম্যাচ। দুপুর থেকেই ম্যাটাডোর ভাড়া করে দু'দলের সাপোর্টারদের যেতে দেখেছে নমন। পতাকা দুলিয়ে, টিফো উড়িয়ে সব যাচ্ছিল। বাবুও যে গিয়েছে ও জানে।

বাবুর জীবনে ওর ওই ছোট্ট দোকান আর ওয়েসিস ফুটবল ক্লাব ছাড়া আর কিছু নেই। বাবু পৃথিবীকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। একভাগে আছে ওয়েসিস ক্লাবের সাপোর্টাররা আর অন্য ভাগে আছে যারা ওয়েসিসের সাপোর্টার নয়, তারা।

বাবুর একটা প্রেম ছিল। মধুশ্রী নাম ছিল মেয়েটার। কলেজে একসঙ্গে পড়ত ওরা। বড়লোক বাড়ির মেয়ে মধুশ্রী। দেখতে সুন্দর। গানও গাইত ভাল। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, বাবুকে আগলে রাখত খুব। নমনের মনে হত, এই মেয়েটার জন্য বাবু বেঁচে যাবে জীবনে।

তারপর কলেজ শেষ হওয়ার পরে একদিন মধুশ্রী বাবুকে নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। ওর ইচ্ছে ছিল বাবা-মা আর বাড়ির বাকি লোকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে বাবুকে।

নমনের মনে হয়েছিল, যাক এবার ছেলেটার একটা হিল্লে হল তা হলে।

সেদিন রবিবার ছিল। পরের দিন সকালে বাবুর দোকানে গিয়েছিল নমন। আসলে ওর কৌতূহল হচ্ছিল, মধুশ্রীদের বাড়িতে কী হল সেটা জানার।

গিয়ে দেখেছিল খবরের কাগজ খুলে খেলার পৃষ্ঠার ওপর ঝুঁকে বসে আছে বাবু।

"কী রে কাল কী হল?" জিজ্ঞেস করেছিল নমন।

বাবু মুখ না-তুলেই বলেছিল, "ও শেষ হয়ে গিয়েছে। মধুর সামনের মাসে বিয়ে।"

“মানে? সে কী!” নমন কী বলবে বুঝতে পারছিল না। ছেলেটা এমন করে বলছে যেন কিছুই নয়। ব্যাটার মাথা খারাপ জানত, তবে এতটা!

নমন খবরের কাগজটা সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, “আরে, কী বলছিস? তাকা আমার দিকে, তাকা।”

বাবু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, “আরে, পেপারটা সরালি কেন? ওয়েসিস ঘানা থেকে প্লেয়ার আনছে। সেটা পড়ছিলাম! কী যে করিস!”

নমন পেপারটা দলা পাকিয়ে পাশে ছুড়ে বলেছিল, “শালা পেপার! কী বলছিস তুই? মধুশ্রীর বিয়ে মানে?”

“মানে ম্যারেজ! বিয়ে মানে জানিস না?” বাবু বিরক্ত হয়েছিল।

“সে কী! তোকে কে বলল?”

“কে আবার বলবে? ওর বাবা বলল। বলল, ‘দ্যাখো বাবা, তোমাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক পার্থক্য অনেক। ভালবাস বুঝলাম। কিন্তু সেটা দিয়ে তো ভাতের হাঁড়ি চড়বে না। ইলেকট্রিকের বিল, মোবাইলের বিল, ছেলেপিলের স্কুলের খরচ চলবে না। তাই না? তাই বলছিলাম কী, তোমরা আর এগিয়ো না। আমরা ওর বিয়ে সামনের মাসে ঠিক করেছি।’”

নমন অবাক হয়ে বলেছিল, “তোকে বলল আর তুই চলে এলি!”

বাবু সামান্য হেসে বলেছিল, “আরে, উনি তো ঠিকই বলেছেন। আমাদের বাড়ি দেখেছিস? বাবার প্যারালিসিস। বোনের বিয়ে দিতে হবে। মা’র হার্টের প্রবলেম। আর আমার তো জানিসই। সেভেন্টিজের আর্ট ফিল্মের মতো লাইফ আমার। সেখানে অমন মেয়ে মানায় নাকি! তা ছাড়া জানিস তো, মধুশ্রীর বাবা খুব ভালমানুষ। ওয়েসিসের সাপোর্টার তো! সেই নিয়েও কত কথা হল! তুই-ই বল, ওয়েসিসের সাপোর্টার আমায় কিছু বললে আমি সেটা ফেলতে পারি?”

এমন যুক্তি যদি কেউ দেয়, তা হলে আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে! নমন আর কিছু বলেনি।

মাঝে মাঝে নমনের খুব হিংসে হয়। মনে হয়, ওর জীবনটাও যদি বাবুর মতো এমন সাদা-কালো হত! জীবন কেন সহজ হয় না? কেন ওর মন বাবুর মতো সরল নয়? ঈশ্বর ওকে একটা অমন মন দিতে পারলেন না?

নমন জানে না ওর ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কি না। কিন্তু মায়ের আছে।

ওদের বাড়িতে ঠাকুরের সিংহাসন আছে একটা। সুস্থ থাকলে মা নিয়মিত নকুলদানা আর জল দিয়ে পুজো দেয়। কিন্তু যখন মা অসুস্থ থাকে, নমন ওই পুজোর দিকে মন দেয় না। ভাবে, সারা পৃথিবী তো আছেই ঈশ্বরের পুজোর জন্য। ও করল কি করল না তাতে কী আর এসে-যায়! ও শুধু মায়ের জন্য কিছু করতে চায়।

“আরে আরে!” আচমকা সামনে থেকে একটা চিৎকার শুনল নমন। ও সচকিত হয়ে তাকাল।

দেখল একটা লোক, দুটো পা নেই, চাকা লাগানো একটা কাঠের পিঁড়ির ওপর বসে দুই হাত দিয়ে টানতে টানতে রাস্তা পার হচ্ছে। এদিকে সিগনাল খোলা পেয়ে মোড়ের দিক থেকে বাস, অটো, গাড়ি হইহই করে ছুটে আসছে।

সর্বনাশ! এবার যদি লোকটা চাপা পড়ে! নমন টেনশনে কী করবে বুঝতে পারল না। যাবে কি দৌড়ে? টেনে আনবে লোকটাকে? কিন্তু ও যে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে! গিয়েও কিছু সুবিধে করতে পারবে

না। তা হলে?

ভয়ে আর টেনশনে কাঁটা হয়ে নমন দেখল বাস, গাড়ি, অটো এসে পৌঁছনোর আগেই লোকটা নির্বিকারভাবে রাস্তা পেরিয়ে গেল ঠিক। বাপ রে! নমনের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

পাশে দাঁড়ানো একজন ট্যাক্সিচালক আচমকা শব্দ করে হেসে উঠল। নমন সামান্য অবাক হয়ে তাকাল। দেখল, লোকটা ওর দিকে তাকিয়েই হাসছে।

নমন পালটা হাসল সামান্য।

লোকটা হাতে ধরা জলের বোতলের ছিপি খুলে বলল, "আরে দাদা, অত টেনশন নেবেন না। ওই মালকে আমি রোজ দেখি। এভাবেই রাস্তা পার করে। ওর কিচ্ছু হবে না, কিন্তু দেখবেন ওর জন্য অন্যদের কিছু না কিছু একটা হয়ে যাবেই। শালা!"

নমন কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। দেখল, সামনের বড় বিল্ডিং থেকে বিজন বেরিয়ে আসছে এদিকে। ও সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বিজন কাছে আসতেই গাড়ির সামনের দরজাটা খুলে দিল।

বিজন উঠে বসল। দরজাটা বন্ধ করে, নমন নিজেও উঠল পেছনের সিটে।

বিজনের মুখচোখ ভাল ঠেকছে না। দেখে মনে হচ্ছে মুড অফ। নমন পেছনের সিটে রাখা জলের বোতল এগিয়ে দিল বিজনের দিকে। বিজনের কিডনির কিছু একটা গোলমাল আছে। বারবার অল্প অল্প করে জল খায়।

বিজন জলের বোতলটা নিল হাত বাড়িয়ে। তারপর বলল, "শুয়োরের বাচ্চাটা যদি ভেবে থাকে পঁচিশ লাখ মেরে দেবে তবে ভুল ভাবছে। ওর পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হলেও টাকাটা বের করে নেব আমি। জানে তো না টাকাটা আমার নয়! ওর বাপের!"

নমন চুপ করে রইল। ও জানে, কথাটা ওকে বা ওদের ড্রাইভার ভানুকে উদ্দেশ করে বলা নয়। এটা বিজন একা নিজের মনেই বলছে।

বিজন এমন করে বলে যেন ওরা কেউ নেই আশপাশে।

এই সাত দিনে মোটামুটি একটা ব্যাপার শিখে গিয়েছে নমন, বিজন নিজে থেকে না বললে নমন কথা বলে না। খুব দরকার পড়লে আলাদা, কিন্তু এমনিতে বিজন পছন্দ করে না ও কথা বলুক।

বিজনের এখানে নমনের খুব কিছু কাজ নেই। এই সঙ্গে থাকা, ব্যাঙ্কের কাজ করা। বাড়ির বিল-টিল জমা করা। এইসব খুচখাচ। ভারী কাজ নয় তেমন। তবে বিজন ডাকলেই হাজির হতে হবে। আসলে সারাক্ষণ সজাগ হয়ে থাকাটাই ওর কাজ।

এতে একটা একঘেয়েমি আছে বটে, কিন্তু সেটাকে মাথায় আনতে চায় না ও। মাসে দশ হাজার টাকা কম নয়! তাও এমন গায়ে পড়ে পাওয়া চাকরিতে।

গাড়িটা গড়িয়াহাটের দিকে এগোচ্ছে। বাইরে গরম থাকলেও গাড়ির ভেতরে বেশ ঠান্ডা। এসি চলছে। নমন জানে না এখন ওরা কোথায় যাবে।

"তোমার সেই বান্ধবীর জন্য একটা খবর আছে," আচমকা সামনে থেকে বিজন বলল।

"স্যার, কিছু বলছেন?" নমন একটু অবাক হল।

"তোমার ওই বান্ধবী! ইলাক্ষী! খবর আছে। বুঝলে?"

"ও..." নমন আর কী বলবে বুঝতে পারল না।

“মিতুল ইলাক্ষীকে প্রাথমিকভাবে ওকে করেছে ফিল্মের জন্য। কিন্তু সেকেন্ড লিড। আর বাংলা উচ্চারণটা ওর খারাপ। ‘র’, ‘ড়’-র জ্ঞান নাকি নেই। নেক্সট উইক থেকে ওয়র্কশপ করবে মিতুল। ইলাক্ষীকে থাকতে হবে। বুঝেছ?”

“হ্যাঁ স্যার!” নমন কী বলবে বুঝতে পারল না। আর এটাও বুঝতে পারল না যে, এসব ওকে কেন বলছে বিজন। এসব তো ওকে বলার কথা নয়।

বিজন এবার সিট বেল্টটা খুলে আলতো করে পেছনের দিকে ঘুরল। বলল, “বাড়িতে তো বললে মা আর তুমি থাকো। তা, এমন মেয়ের চক্করে পড়লে কী করে?”

বিজন এমন আচমকা কথাটা বলল যে, নমন ঘাবড়ে গেল।

বিজন বলল, “তুমি প্রেমিক টাইপ, আমি বুঝি। কিন্তু মেয়েটি প্রেমিকা টাইপ নয়। অন্তত তোমার জন্য নয়। শোনো, জীবনের প্রায়োরিটিগুলো সবার একরকম নয়। বুঝেছ? মেয়েদের সঙ্গে পেঁয়াজি করতে যেয়ো না কিন্তু। ওরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। অনেক বেশি প্র্যাকটিকাল। ওরা ফালতু ইমোশন খরচ করে না। বুঝেছ?”

নমন মাথা নাড়ল। আজ বিজনের কী হয়েছে! এসব তো বলে না লোকটা।

বিজন বলল, “কিচ্ছু বোঝোনি। তুমি মরেছ আমি জানি। যেখানে নিজে সদ্য কাজ পেয়েছ সেখানে প্রথমেই নিজের পছন্দের মেয়েকে কেউ প্রোমোট করতে যায়? গান্ডু নাকি তুমি?”

নমন মাথা নামিয়ে নিল।

“কোনও ভাল আর নিজের লেভেলের মেয়ে দেখে প্রেমে পড়ো। এসব করতে যেয়ো না। পেছন মারা যাবে তোমার,” বিজন হাসল, “এই যে ইলাক্ষীর খবরটা দিলাম তোমায়, এটা কি তুমি ওকে জানাতে চাও? নাকি প্রোডাকশনের কাউকে বলব ফোনে বলতে? বলো তুমি।”

“আমি? মানে ইয়ে স্যার... প্রোডাকশনের কেউ...”

“ফেটে তো যাচ্ছে বুক, না? তুমি বললে তো কিছু ব্রাউনি পয়েন্টস পাবে ভাবছ! কিচ্ছু পাবে না। তোমাকে ন্যাকা ন্যাকা করে থ্যাঙ্কস বলে কাটিয়ে দেবে। তারপর হয় হিরোর সঙ্গে, নয় আমার সঙ্গে গা ঘষবে। বুঝেছ? সেটাও কাজের জন্য।”

নমনের কান-মাথা লাল হয়ে গেল। বিজনের যে-কাজটা হয়নি, তার যে-রাগ আছে, সেটা কি এমন ইনডাইরেক্টলি ওর ওপর বের করছে? ও আড়চোখে ভানুর দিকে তাকাল।

ভানু নির্বিকারভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। আসলে ভানুর এসব অভ্যেস আছে। দশ বছর কাজ করছে বলেই হয়তো।

বিজন থামল একটু, তারপর বলল, “তুমি খবর দেবে ইলাক্ষীকে। কাল ফোন করে বলবে যে, ওয়র্কশপে যেন পৌঁছে যায়। সোমবার ঠিক সকাল দশটায়। ঠিকানা ওকে প্রোডাকশন থেকে মেসেজ করে দেওয়া হবে। বুঝেছ?”

“আমি বলব স্যার?” নমন ঢোঁক গিলল।

“হ্যাঁ। তারপর যা বললাম মিলিয়ে নিয়ো,” সোজা হয়ে বসল আবার। তারপর বলল, “ভানু, ওকে মনোহরপুকুরের কাছে নামিয়ে দিস তো। নমন তোমার আজ ছুটি, বাড়ি যাও।”

বড়রাস্তায় ওকে নামিয়ে বিজনের গাড়িটা বেরিয়ে গেল। একটু অবাক হলেও, ভাল লাগল নমনের। এমনিতে এই ক'দিন রাত সাড়ে দশটা এগারোটার আগে ছাড়া পায়নি। সেখানে এখন এমন ছুটি পেয়ে গেল। বিজন লোকটাকে বোঝা দায়।

ও মোবাইল বের করে সময় দেখল। বিশুদার দোকানটা খোলা আছে। কে জানে, বাবু ওষুধটা নিয়ে রেখেছে কি না!

বড়রাস্তা থেকে ভেতর দিকে ঢুকলেই কেমন যেন সব পালটে যায়। আজকাল খুব উজ্জ্বল আলো লাগানো হয়েছে চারদিকে। কেমন একটা বিয়েবাড়ি বিয়েবাড়ি ভাব! তাও ফাঁকা রাস্তায় গাছের ছায়াগুলোকে কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হল নমনের। তার মধ্যেই আচমকা হাওয়া দিল একটা। গরমের দিনে রাতের দিকের এই আচমকা হাওয়া যে কী সুন্দর! নমনের হঠাৎ ক্লান্ত লাগল খুব। মনে হল, এমন হাওয়ার নীচে কতদিন ঘুমোয়নি!

দোকানে বাবু নেই। মিনু বসে আছে। হাতে ধরা একটা বই। মন দিয়ে পড়ছে সেটা।

মিনু, বাবুর বোন। বছর চব্বিশেক বয়স। বাংলায় এমএ করে চাকরি খুঁজছে। কিন্তু পায়নি এখনও। বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিউশনি করে মিনু।

মেয়েটার গায়ের রং শ্যামলা। ছোট্ট কপাল। দেখতে খুব সাধারণ। কিন্তু তাও কেমন একটা মন ভাল করা ব্যাপার আছে মিনুর মধ্যে। ওকে দেখলেই ভাল লাগে নমনের।

ওর পায়ের শব্দে মিনু মুখ তুলে তাকাল। হাসল সামান্য। গজদাঁত আছে। হাসিটা ভারী সুন্দর।

নমন জিজ্ঞেস করল, "বাবু আসেনি?"

"না গো। মাঠ থেকে এখনও ফেরেনি। তবে এই যে কাকিমার ওষুধ। বিশুদা দিয়ে গিয়েছে," মিনু হাত বাড়িয়ে একটা খাম দিল। মিনুর আঙুলগুলো কী সুন্দর! বাঁ হাতের অনামিকায় আগে একটা সোনায় বাঁধানো লাল পাথরের আংটি পড়ত। সেটা নেই। তার জায়গায় সাদা সরুমতো একটা দাগ। এটার বিষয়ে জানে নমন। গত সপ্তাহে ওটা বিক্রি করতে হয়েছে। আচমকা কিছু টাকার দরকার ছিল বাবুদের।

নমন খামটা নিয়ে হাসল। ও জানে, সকালে টাকাটা বিশুদাকে দিয়ে দিলেই হবে।

"থ্যাঙ্কস," নমন চলে যাবে বলে পা বাড়াল।

"নমনদা," মিনু ডাকল, গলায় সামান্য দ্বিধা।

"কিছু বলবে?" নমন তাকাল।

"না মানে, মা বলছিল তুমি অনেকদিন বাড়ি আসো না! তাই... মানে... আমি বলেছি নতুন চাকরি তো তাই ব্যস্ত। তুমি খুব ব্যস্ত, তাই না নমনদা?"

নমন হাসল, "ওই আর কী!"

মিনু বলল, "ও, আর-একটা কথা, রুপিনবাবুর লোক একজনকে নিয়ে এসেছিল। বলছিল তোমার দোকানটা ভাড়া নিতে চায়। সেই নিয়ে কথা বলবে।"

"দোকানটা তো জানোই কী অবস্থায় আছে, তাই না?"

মিনু মাথা নাড়ল। বলল, "লোকটা আসবে আবার। এই যে কার্ড দিয়ে গিয়েছে। লোকটার নাম মানব সেন। তোমার দোকানটা তো প্রাইম লোকেশনে। তাই সেখানে নাকি ক্যাফে বানাবে।"

"তোমাকে লোকটা এত কিছু বলল?" নমন অবাক হয়ে তাকাল মিনুর দিকে।

"না না, রুপিনবাবুর যে-লোকটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সে বলল," মিনু যেন একটু লজ্জা পেল, "আসলে লোকটা এত বেশি কথা বলে!"

নমন বুঝল। রুপিনের কাছেই কাজ করে লোকটা। গুপি নাম। মেয়ে দেখলেই গায়ে পড়ে প্রচুর কথা বলে।

"ঠিক আছে। আসুক আবার, দেখা যাবে," নমন হাসল।

মিনু সামান্য ইতস্তত করল, তারপর বলল, "রুপিনবাবুর টাকাটা কিছুতেই শোধ করা যায় না, না নমনদা? আমার যদি উপায় থাকত আমি তোমায় টাকাটা দিয়ে দিতাম!"

নমন কিছু বলার আগেই আচমকা আবার হাওয়া উঠল চারপাশে। আর হাওয়ায় হাওয়ায় গাছের পাতা, বকুলের পাপড়ি, সামান্য কুটো ভেসে এল কলকাতার এই ছোট্ট আর প্রায় নির্জন একটা গলিতে। আর, দূর থেকে বড় বড় আলোর ছটায় ঘুম-না-আসা চোখে ছোট্ট পাখি দেখল, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখোমুখি। নিশ্চুপ, একাকী।

সাত

বাবার গলার আওয়াজে ঘুম ভাঙল রতিশের।

একতলায় একটা উঠোন আছে। তার একদিকে টিউবওয়েল। মা বলে চাপাকল। সেই কলপাড়ে বাবা সকালে স্নান করে, আর স্নান করতে করতে সূর্যমন্ত্র পাঠ করে। সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে রতিশ। ও ভেবে অবাক হয়ে যায়, একটা লোক কী করে একই কাজ সারা জীবন ধরে একভাবে করে যেতে পারে! মাঝে মাঝে মনে হয়, এই লোকটার ছেলে হয়ে ও এমন হল কী করে!

কোলবালিশটাকে ভাল করে জড়িয়ে ধরল রতিশ। আজ কেমন যেন কিছু না করার ইচ্ছে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আবার ছোট হয়ে যায়। ওই তো বাবা স্নান করছে। এবার তবে বাবা সেই ছোটবেলার মতো কারখানায় যাবে। মা এসে ওকে ডাকবে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। বলবে, ওঠ, তোর রুটি আলুভাজা রেডি আছে।

জানলা দিয়ে আজ যেন সেই ছোটবেলার মতো আলো আর হাওয়াও আসছে। বালিশ থেকে একটু মুখ তুললেই যাদবপুরের এই ছোট্ট পাড়ার বড় অশ্বত্থ গাছটা দেখা যাচ্ছে। হাওয়ায় মাথা নাড়ছে। সবুজ-হলুদ পাতাদের ঝিলমিল ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। এক-একটা দিন রতিশের আর রতিশ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।

ও কোলবালিশটা চেপে ধরে আর-একপাশ ফিরল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখটা ফিরে এল সামনে। আবার এসেছে। আশ্চর্য! কিছুতেই মুখটাকে সরাতে পারছে না স্মৃতি থেকে। কিন্তু সত্যি কি ও চাইছে সরাতে?

এসব আর ভাল লাগছে না। এই বয়সে এসে এসব পছন্দ-টছন্দ এখন ঝামেলা বলে মনে হয়। কিন্তু আমাদের বোধ যা চায় সেটা যদি জেদি বাচ্চার মতো অবুঝ এই মনটাও চাইত, তা হলে ল্যাঠা চুকেই যেত! কিন্তু সেসব তো হওয়ার নয়। যা করলে তুমি বিপদে পড়বে, তোমার জীবনে ঝামেলা হবে, মন সেসব জায়গাতেই তোমাকে ঠেলবে বারবার। রতিশ ভাবছে, সেদিন ওই কালিকাপুরে না-গেলেই হত। চাপ দিতে গিয়ে এখন নিজেই উলটো চাপ খেয়ে বসে আছে। এই যে আজ সকাল থেকে এসব হাবিজাবি জিনিস মনে হচ্ছে, সে কি আর এমনি এমনি?

দরজায় আলতো করে টোকা পড়ল এবার। কে আবার এল! নিশ্চয়ই কাজের দিদিকে পাঠিয়েছে মা। সামান্য বিরক্ত হল রতিশ। ও বিরক্তিটা লুকোল না। বলল, "কে? এখন কথা বলতে পারব না।"

"আমি রে রতু।"

মায়ের গলাটা কেমন যেন ভিতু ভিতু শোনাল। আজকাল এমন করেই মা কথা বলে ওর সঙ্গে। মানে, সারাক্ষণ একটা ভয় আর সংকোচ যেন! যেন এই বকে দেবে রতিশ। অপমান করে দেবে।

রতিশ অবাক হল। মা তো পারতপক্ষে আসে না ওপরে। কাজের দিদিকে দিয়েই খাবারদাবার পাঠিয়ে দেয়। কোনও কথা বলার থাকলে জানিয়ে দেয়। সেখানে মা নিজে এল কেন! সিরিয়াস কিছু কি!

বিছানা থেকে উঠল রতিশ। একটা হাতকাটা গেঞ্জি গলাল মাথা দিয়ে। তারপর চোখ মুছতে মুছতে খুলে দিল দরজাটা। আড়চোখে দেখল টেবলের ওপর পোড়া সিগারেট একটা বাটিতে স্তূপ হয়ে আছে। মা দেখবে।

দেখুক। আর পরোয়া করে না।

মা ঘরে ঢুকল না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল একটু।

"কী হয়েছে?" রতিশ জিজ্ঞেস করল।

মা বলল, "ওই নীচে বুচা এসেছে। আমি বললাম তুই শুয়ে আছিস। তাও জোর করল। খুব নাকি দরকার। তাই ভাবছিলাম..."

রতিশ মায়ের দিকে তাকাল। মা যেন কেমন শুকিয়ে গিয়েছে। চোখের তলায় কালি। মুখটাও ম্রিয়মাণ। মা কি অসুস্থ?

ও জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি শরীর খারাপ?"

মা তাকাল ওর দিকে। চোখেমুখে বিস্ময়। কত যুগ পরে যে রতিশ এই প্রশ্নটা করল!

রতিশ এবার সামান্য ঝাঁজালো গলায় বলল, "কী জিজ্ঞেস করছি শুনছ না? শরীর খারাপ তোমার?"

মা মাথা নাড়ল, "কই না তো! আসলে তোর বাবার..."

"বাবার কী?" রতিশ তাকাল।

"তোর বাবার হার্টের প্রবলেম দেখা দিয়েছে। ডাক্তার নানান টেস্ট দিয়েছে। বলছে পেস মেকার বসাতে হতে পারে।"

"টেস্ট করিয়েছে বাবা?"

মা আবার চুপ করে রইল।

"আঃ," এবার বিরক্ত হল রতিশ, "এমন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কথা বের করতে হয় কেন তোমার থেকে? করিয়েছে টেস্ট?"

"না, অনেক টাকার ব্যাপার তো! তাই..." মা আর কী বলবে খুঁজে পেল না যেন।

মাথা গরম হয়ে গেল রতিশের। না-হয় বাবা-মায়ের চোখে ও খারাপ ছেলে। কিন্তু ছেলে তো! ওকে বলতে কী হয়! ওর কি টাকার অভাব নাকি?

রতিশ এগিয়ে গিয়ে চাবি বের করল ড্রয়ার থেকে, তারপর আলমারিটা খুলল। আলমারির মধ্যে একটা ছোট লকার আছে। নাম্বারিং লকের। সেটার কি-প্যাডে নাম্বার টাইপ করে ডালাটা খুলে ফেলল। তারপর সেখান থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বের করে আবার বন্ধ করে দিল লকারটা। মায়ের কাছে গিয়ে টাকাটা বাড়িয়ে দিল।

মা অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। মানে, বুঝতে পারছে না কী করবে এসব নিয়ে।

রতিশ মায়ের হাত ধরে জোর করে গুঁজে দিল টাকাটা। বলল, "রাখো। বাবাকে টেস্ট করিয়ে নিতে বোলো। আরও লাগলে আরও দেব। চিন্তা নেই। আমি আছি তো!"

"তোর বাবা জানলে খুব রাগ করবে," মা মাথা নিচু করে নিল।

"করলে করবে! আগে জীবন না আগে রাগ! যাও বুচাকে পাঠিয়ে দাও," রতিশ গম্ভীরভাবে বলল।

মা মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল নীচে।

এই ঘরের লাগোয়া বাথরুম আছে। সেদিকে গেল রতিশ। পেচ্ছাপ পেয়েছে। কমোডের সামনে দাঁড়িয়ে হালকা হতে হতে ভাবল, বুচা এখন এল কেন? আবার কি ঝামেলা লেগেছে কোনও? জনি কিছু করল নাকি?

আসলে সামনে একটা অনুষ্ঠান আছে। জলা বস্তির মাঠে দু'দিনব্যাপী সিনেমা দেখানোর আয়োজন করেছে রতিশ। মানুষের সমস্যা দিনকে দিন বাড়ছে। কমছে না। আর সত্যি বলতে কী, দেশের অবস্থা যেমন হয়ে গিয়েছে, তাতে সমস্যা কমবে বলেও আর মনে হয় না। না, রতিশ নেগেটিভ হতে চায় না, ও আসলে রিয়েলিস্ট। যেটা সত্যি সেটা মানতে ওর অসুবিধে হয় না।

তাই রতিশ যখন মানুষের কষ্ট কিছু কমাতে পারছে না, তখন ভেবেছে মাঝে মাঝে ওদের একটু এন্টারটেন করলে তো খারাপ হয় না। মনটা রোজকার অভাব অনটন থেকে কিছুটা হলেও সরে থাকবে।

এই সিনেমা দেখানো নিয়ে ভাল প্রচার করেছে ও। লোকজনের মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাবও দেখতে পাচ্ছে। আর সেটাতেই জনির সমস্যা শুরু হয়েছে। জিতেশদাকে বলে রতিশের এই প্রোগ্রাম বানচাল করার চেষ্টা করেছে। জিতেশদা যদিও কিছু বলেনি। জিতেশদা আসলে বোঝে। এসব পাতি ঝামেলায় পড়লে জিতেশদার ক্ষতি।

উলটে জিতেশদা বলেছে, জনি একটা নাইট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারে তো। সিনেমার শো শেষ হয়ে আবার ক'দিন পরে ওই মাঠেই হতে পারে সেটা।

জনি আপাতত সেই নিয়ে খুশি।

কিন্তু রতিশ তো প্ল্যান করেই রেখেছে। সিনেমার শো হয়ে গেলেই ওই মাঠে ও একটা মেলা বসিয়ে দেবে। দেখবে শালা, ওই জনি কী করে ক্রিকেট খেলায়! মেলা থেকে যা টাকা উঠবে, তার ফিফটি পারসেন্ট গুঁজে দেবে জিতেশদার পকেটে। জিতেশদাও তা হলে কিছু বলবে না। মনে মনে সব প্ল্যান করা আছে। অত সহজ নয় রতিশকে টেক্কা দেওয়া।

ঘরের দরজায় শব্দ শুনে বুঝল, কেউ একটা ঘরে ঢুকেছে।

বাথরুম থেকেই রতিশ জিজ্ঞেস করল, "কে? বুচা?"

"হ্যাঁ রতুদা, আমি। তুমি সেরে নাও। আমি ওয়েট করছি।"

"ঠিক আছে," ব্রাশে পেস্ট নিয়ে বলল রতিশ।

বুচা জিজ্ঞেস করল, "একটা সিগারেট খাব? তোমার ব্র্যান্ডটা দারুণ!"

"নে," ছোট্ট করে বলল রতিশ। তারপর ব্রাশ করে নিল। ভাবল স্নানটাও করে নিলে ভাল হয়। কারণ, কখন আবার সময় পাবে কে জানে!

সব সেরে ঘরে এসে দেখল, বুচা টেবিলের ওপর রাখা একটা ম্যাগাজিন পড়ছে।

গতকাল একটা অনুষ্ঠান ছিল। একটা লিটল ম্যাগাজিনের উদ্বোধন করা হয়েছিল সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের কাছের একটা হল-এ। রতিশকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল।

ওর যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কী করবে? যেতে হয় এসব জায়গায়। তবে গিয়েছিল সামান্য সময়ের জন্যই। সেখানে একটা উত্তরীয়, মিষ্টির প্যাকেট আর এই বইটা ধরিয়ে দিয়েছিল। বুচা পড়ছে এখন বইটা।

পাঞ্জাবি পরতে পরতে রতিশ বলল, "বাবা! তুই আবার কবে থেকে এসব পড়িস? কবিতা বুঝিস?"

বুচা কেমন একটা নিমপাতা খাওয়ার মতো মুখ করে তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, "এগুলো কি কবিতা আমি বুঝি না। শালা না আছে মাথা না মুন্ডু! এসব লিখে কেন বই-ফই ছাপায় বলো তো! শুনেছি বই ছাপাতে গাছ কাটতে হয়। এসব হাবিজাবি ছাপানোর জন্য কত গাছ নষ্ট হল বলো তো?"

রতিশের হাসি পেল। বুচার ব্যাপারটাই এমন। সব ব্যাপারেই ওর একটা নিজের মত আছে।

"কেন কী হয়েছে?"

বুচা বলল, "একটা লাইন শোনো, 'আগুন-ফুলকি তুমি মহাবিশ্বে নশ্বর জাতীয়তাবাদ/ তুমি মহাব্যোম, বিপ্লব আর বিদ্রোহের রাশিয়ান স্যালাড!' এর মানে কী আমায় বোঝাও। আন্টু-বান্টু যা লিখবে তাই কবিতা? শালা, এসব বই রেখেছ কেন বাড়িতে?"

রতিশ হাসল, "তুই অনেক ক্রিটিক মারিয়েছিস। চুপ কর। এখন এসেছিস কেন বল।"

"ও হ্যাঁ," বুচা বলল, "আরে, জয়মোহন কলেজে বিশাল ক্যাচাল লেগেছে। স্টুডেন্টদের অ্যাটেনডেন্স নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। তার মধ্যে অপোজিশন ফুট কাটছে। তাই তোমার কাছে এসেছি।"

"কেন, ওখানে আমাদের ছেলেপিলেরা নেই?" রতিশ বিরক্ত হল। কলেজ পলিটিক্সেও এখন ওকে মাথা ঘামাতে হবে?

বুচা বলল, "ব্যাপক ক্যালাকেলি হয়েছে। পুলিশ এসেছে। ওসি নিজে ফোন করেছিল জিতেশদাকে। জিতেশদা পার্টি অফিসে বলল, তোমায় খবর দিতে। তোমার দুটো ফোনই বন্ধ বলছে!"

হ্যাঁ বন্ধই বটে। গতকাল রাতে ফোন বন্ধ করে দিয়েছিল রতিশ। আসলে সেদিনের পর থেকে মাঝে মাঝে যে কী হচ্ছে ওর! মেয়েটার নাম পৃথাল। ডাকনাম বিনি। মেয়েটাকে দেখার পর থেকেই কেমন গুলিয়ে গিয়েছে মাথা।

কিন্তু লড়াই করছে রতিশ। নিজের সঙ্গে জমিয়ে লড়াই করছে। আর-একটা স্বপ্নার মতো ব্যাপার ঘটুক ও আর চায় না। কিন্তু বুঝতে পারছে তিল তিল করে ও হেরে যাচ্ছে লড়াইতে। আর এ পরাজয় বড় সুখের, বড় আনন্দের!

"ঠিক আছে চল। তুই নীচে যা, আমি আসছি। দেখি কী ছড়িয়ে রেখেছে সবাই।"

বুচা নীচে যাওয়ার পরে, সারা ঘরটা একবার দেখল রতিশ। তারপর দুটো ফোনকে অন করে পকেটে ঢোকাল। ড্রয়ার থেকে মানিব্যাগ বের করে দেখল কত টাকা আছে। সেটা সাইড ব্যাগে ভরে নিল। তারপর দেওয়ালের হুক থেকে বাইকের চাবিটা পাড়ল। আজ কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কী করবে! জিতেশদা বলে পাঠিয়েছে যে!

বাইকে বুচাকে বসিয়ে স্টার্ট দিল রতিশ। তারপর পাড়াময় গর্জন তুলে বেরিয়ে গেল।

বুচা পেছনে বসে বলল, "আচ্ছা রতুদা, ওই কালিকাপুরে গিয়েছিলে? কথা হল ওদের সঙ্গে?"

রতিশ উত্তর দিল না। কী হবে উত্তর দিয়ে? বুচা বুঝতে পারবে কিছু?

সেদিন ওই বাড়িতে কেউ ছিল না। শুধু ওই মেয়েটা ছিল। একটা গোলাপি টপ আর লেগিংস পরে এসে খুলে দিয়েছিল দরজাটা। আশপাশের বাড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলো এসে পড়েছিল মেয়েটার মুখে। মেয়েটা চোখ কুঁচকে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

আর রতিশ যেন নড়তে পারছিল না!

তাও কোনওমতে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমি রতিশ। আপনি?"

"আমি বিনি, মানে পৃথাল। কেন? কাকে চান?"

"রুনুদেবী আছেন?"

"না, মা নেই। মামুর সঙ্গে বেরিয়েছে। কী ব্যাপার আমায় বলতে পারেন।"

"না ঠিক আছে। আমি পরে আসব," রতিশ যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ওই সেই ট্রাক বসে যাচ্ছিল বুকে। ওর ভার যেন আর সহ্য করতে পারছিল না। আবার সেই ঝামেলায় পড়তে হবে নাকি? সেই ভয়ে পালাচ্ছিল রতিশ।

বিনি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

রতিশ আর দাঁড়ায়নি। চিরুনি পকেটে লুকিয়ে, পেছন ফিরে বাইকের দিকে হাঁটা দিয়েছিল। এই মেয়ের সামনে ও কী বলবে?

এখন বাইক চালাতে চালাতে আবার মনে পড়ে গেল ওই মুখটা। বুঝল, মধুর পরাজয়ের দিকে আর-এক ধাপ এগিয়ে গেল রতিশ।

কলেজের সামনেটা কেমন যেন থমথম করছে। পুলিশের পিকেটিং আছে। কিছু ছেলেপিলেও ঘুরছে এদিক-ওদিক।

বাইকটাকে স্ট্যান্ড করিয়ে নামল রতিশ।

বুচা পাশ থেকে চাপা গলায় বলল, "তুমি রতুদা একটা সাদা এসইউভি কেনো। আজ বাদে কাল কাউন্সিলর হবে। এই সময়ে কেউ এমন বাইকে করে ঘোরে! একটা প্রেস্টিজ আছে না?"

"বাইকটার দাম জানিস?"

"তাও," বুচা বলল, "আরে বাবা, এখানে লোকে চাকার সংখ্যা দেখে ইজ্জত দেয়, বুঝলে? এই সব ছেলে-ছোকরারা বাইক নিয়ে ঘুরছে আর তুমিও তাই! তফাত কই? ওই দ্যাখো না, ওই যে ছেলেটা নিজের বাইকের পেছনে একটা মেয়েকে বসাল। ওর সঙ্গে তোমার পার্থক্য কোথায়?"

বুচার হাত দিয়ে দেখানো বাইকটার দিকে তাকাল রতিশ আর সঙ্গে সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল। মনে হল আচমকা কেউ পঞ্চাশ কেজির হাতুড়ি দিয়ে মেরেছে বুকের মধ্যে।

রতিশ দেখল, ওর থেকে কুড়ি হাত দূরে একটা রোগা চাপ দাড়িওলা ছেলের বাইকের পেছনে উঠে বসল বিনি। জিনস আর টপ পরে আছে বিনি। চুলটা টেনে পেছন দিকে বাঁধা। আড়াআড়ি করে নেওয়া একটা ব্যাগ।

তবে যেটা রতিশের বুকের মধ্যে সূচের মতো ফুটল সেটা হল হাত! বিনির হাত দুটো ছেলেটার কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। দু'জনেই হাসছে। আশপাশে কোনও দিকে খেয়াল নেই।

কে ছেলেটা? কার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে বিনি? চোয়াল শক্ত করে তাকিয়ে রইল রতিশ। মনে হল প্রচণ্ড গরম লাভা হৃৎপিণ্ড থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে।

"কী হল রতুদা?" বুচা জিজ্ঞেস করল।

রতিশ আঙুল তুলে বাইকে বসা ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল, "ওই শুয়োরের বাচ্চাটার সম্বন্ধে খবর জোগাড় কর তো! দু'দিনের মধ্যে আমায় জানাবি ওর ডিটেল। বুঝলি?"

আট

বাদুদা ফোন করেছিল সকালে। ইলা ধরেনি। বেকার লোক একটা। কাজের কাজ নেই সারাক্ষণ ফোন করে হাবিজাবি কথা। মাথা গরম হয়ে যায়!

বাদুদার একটা এজেন্সি আছে। প্লেসমেন্ট এজেন্সি। উঠতি মডেল, অভিনেতাদের কাজকম্ম পাইয়ে দেয়। তার বদলে ওদের যা ফি হয়, তার একটা পারসেন্টেজ নেয়।

এক সময় বাদুদার কাজ ভাল চলত। কিন্তু ইদানীং তাতে ভাটা পড়েছে। এমনিতেই দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভাল নয়। ফলে অন্যান্য ব্যবসার মতো এই ফিল্ম বা মডেলিং-এর ব্যবসাতেও টান পড়েছে। মার্কেটে সেই পরিমাণ কাজই নেই! এসব জানে ইলা। তাই কেউ ফোন করে বেকার ভ্যাজর ভ্যাজর করলে বিরক্ত লাগে।

বাদুদা গতকালও ফোন করেছিল। ও ধরেনি। মিতুলের ওখানে ওয়র্কশপ হচ্ছে। কেন ফালতু তার মধ্যে এসব লোকের ফোন ধরবে? গতবার কী হয়েছিল ভুলে গিয়েছে?

বাদুদা মাস চারেক আগে একটা কাজ দিয়েছিল ইলাকে। ফিল্মের। তাতেও এমন ওয়র্কশপ ছিল। সেখানে নিজের টাকায় দশ দিন যাতায়াত করে জানল যে, ফিল্মটাই নাকি আর হবে না! কীসব কাণ্ড! বেকার অতগুলো টাকা নষ্ট হয়েছিল। সেই বাদুদার ফোন ও ধরবে? পাগল নাকি?

আজ ওয়র্কশপ নেই। মিতুল ছুটি দিয়েছে। ভালই হয়েছে। ওর একটা কাজ আছে সেটা মিটিয়ে নেবে। তার আগে একটু ব্যাঙ্কেও যেতে হবে। একটা চেক দিয়েছে গতকাল প্রোডাকশন হাউজ থেকে সেটা জমা করে দেবে। এর পরের বার থেকে সমস্ত পেমেন্ট ডাইরেক্ট ব্যাঙ্কে হবে।

টাকাটা দরকার ছিল ওর। একটা ফোন কিনতে হবে। তা ছাড়া স্কিনের ট্রিটমেন্টও করাতে হবে। ইলা ভাবে, ও তো আর বিদেশে গিয়ে এসব করার মতো রোজগার এখনও করে না। কিন্তু যখন তেমন রোজগার করবে, ও বিদেশেই যাবে বিউটি কারেকশনের জন্য।

মা অফিস চলে গিয়েছে। বাবা আজ আর নেশা করে নেই। নিজের ঘরে খবরের কাগজ নিয়ে বসে আছে একা। না, ওইদিকে যাবে না ইলা। কথা বললেই কিছু না-কিছু নিয়ে ঠিক ঝামেলা লেগে যাবে। মুডটাই বিগড়ে যাবে একদম। আজ মুডটা ঠিক রাখতে হবে। কারণ, ও যে কাজটায় যাচ্ছে সেটা খুবই দরকারি। ওর নিজের কেরিয়ারের জন্য দরকারি।

সকালে ভারী ব্রেকফাস্ট করে ইলা। আজও করেছে। তারপর বাকি দিনটা একটু একটু করে খায়। আগে যা ওজন ছিল সেটা থেকে প্রায় ন'কেজি কমিয়েছে। এখন তো আর আগের সময় নেই। এখন লোকজন সারাক্ষণ ইন্টারনেটে নামকরা মডেল আর অভিনেতাদের দেখে দেখে, এখানকার নায়ক-নায়িকাদেরও সেরকমই লিন আর ফিট দেখতে চায়।

কাজের দিদি, মানে রুমাদি আসবে বেলা এগারোটার পরে। ও রান্নাঘরের সিঙ্কে এঁটো বাসন রেখে দিল। তারপর বাবার খাবারটা বের করে ঢেকে রাখল টেবিলে। দুপুরে খাওয়ার আগে রুমাদি গরম করে দেবে বাবাকে।

আজ ওয়াটার পিউরিফায়ার সার্ভিস করার লোক আসার কথা। কে জানে কখন আসবে! সে সময় বাবা মদ না-খেয়ে থাকলেই হয়! বাবাকে তো আর ভরসা নেই। নেশা করলে মানুষ থাকে না।

টিং করে মোবাইলে মেসেজ ঢুকল একটা। কে আবার এখন মেসেজ করল? মোবাইলটা দেখল। আরে মিতালি!

ইলা মোবাইলের স্ক্রিনে ট্যাপ করে খুলল মেসেজটা। মিতালি নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছে! ওঃ, কী হল আবার! এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারে না ইলা। সারাক্ষণ ঘ্যানঘ্যান! আরে বাবা, তোর অত প্রেম করার দরকার কী! আশ্চর্য! এসব ন্যাকামো সহ্য করতে পারে না ইলা। মনে হয়, দেয় ভাল করে কথা শুনিয়ে!

কিন্তু পারে না। মিতালি বড় বাড়ির মেয়ে। ওর বাবা আর সৎ-মায়ের কানেকশন খুব ভাল। মিতালির দাদা মানব সেন নাকি একটা বিদেশি ক্যাফে চেনের সঙ্গে কথা বলেছে। মনোহরপুকুরের কাছে একটা জায়গাও দেখেছে। মানব ওদের বিজ্ঞাপনে ইলাকে নেবে। দ্য ফেস অফ দেয়ার কফি! কম কথা নয়। তাই বিরক্ত হলেও কিছু করার থাকে না। মিতালিকে চটাতে পারে না।

ইলা রিপ্লাই দিল, দু'মিনিটে নীচে আসছে।

বেরনোর আগে ও শেষবারের মতো সব দেখে নিল। ডিপোজিট স্লিপসহ চেকটা ব্যাগে ঢুকিয়ে মোবাইলটা নিল। বসার ঘরে গিয়ে জুতো পরে নিল। তারপর বাবার ঘরে উঁকি দিয়ে, 'আসছি' বলে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাটের বাইরে।

রাস্তায় আজ কী রোদ! বাইরে বেরিয়েই সানগ্লাস চোখে দিল ইলা। সান বার্ন যাতে না-হয় তার জন্য সান স্ক্রিন লাগিয়েছে। কিন্তু এদেশের সান স্ক্রিনগুলো ভাল নয়।

মিতালি গাড়িটাকে সামনেই পার্ক করে রেখেছে।

রাস্তা থেকেই ইলা দেখল যে, হালকা নীল টিন্টেড গ্লাসের ওদিকে বসে আছে মিতালি। চোখে সানগ্লাস। চুলগুলো আলুথালু হয়ে পড়ে আছে কপালের ওপর।

মনে মনে ঠিক করে নিল ইলা, মিতালিকেই বলবে ব্যাঙ্কে নিয়ে যেতে। সেখানে জাস্ট চেকটা ফেলে আবার বলবে আলিপুরে ছেড়ে দিতে। গাড়ি ভাড়াটা বেঁচে যাবে ওর।

গাড়ির কাচে দু'বার আলতো করে নক করল ইলা। মিতালি মুখ তুলে তাকাল। তারপর ওকে হাতের ইশারায় উঠতে বলল গাড়িতে।

গাড়ির ভেতরটা ঠান্ডা। ইলা ভাল করে বসে সানগ্লাসটা খুলে ব্যাগে ঢোকাল। তারপর খুব ব্যস্ত এমন গলায় বলল, "বল, কী ব্যাপার বল। আমার খুব তাড়া আছে রে! ব্যাঙ্কে যেতে হবে। তারপর আলিপুরেও যেতে হবে।"

মিতালি নিজের সানগ্লাসটা খুলল এবার। ইলা দেখল, যা ভেবেছে ঠিক তাই। মেয়ের চোখ লাল। কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছে!

ইলা তাও বলল, "আবার কিছু হয়েছে? কিন্তু আজ যে..."

“আমি নিয়ে যাচ্ছি তোকে ইলা। কিন্তু তুই একটু আমার কথা শোন। প্লিজ। আমি মরে যাচ্ছি। কুমার আমার সঙ্গে যা করছে, সেটা আর নিতে পারছি না।”

সামনে যে-ড্রাইভার ছেলেটি বসে আছে তাকে চেনে ইলা। নাম মাখন। মিতালির গাড়িই চালায়। বিশ্বস্ত ছেলে। ওকে ব্যাঙ্কের নাম বলে ভাল করে বসল ইলা। বলল, “বল।”

মিতালি শুরু করল। কুমার এই করেছে, কুমার ওই করেছে! কুমার নিজের বউকে আর ছেলেকে নিয়ে সুইটজারল্যান্ড ঘুরতে গিয়েছে। ওকে লুকিয়ে গিয়েছে পুরো ব্যাপারটা। মিতালি কুমারের স্ত্রীর ফেসবুক থেকে জেনেছে ঘটনাটা। তারপর কুমারকে ফোন করলে কুমার ধরেনি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইলা যতদূর সম্ভব মন দিয়ে শুনল। আসলে ঠিকমতো মন বসছে না ওর। সামনে যে-কাজটায় যাবে সেটা খুব দরকারি।

কুমারের সঙ্গে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটেই আলাপ মিতালির। মিতালি জানত যে, কুমারের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে আছে, ক্লাস ফোরে পড়ে। তাও মেয়েটা প্রেমে পড়েছে। অবশ্য এসব ব্যাপারে তো নিয়ম-টিয়ম কিছু হয় না। তাও মানুষের তো নিজের বোঝা উচিত যে, কোন জায়গায় সে কতটা এগোবে। কিন্তু তা নয়, কেউ দুটো মিষ্টি কথা বলল, অমনি গলে গেল একদম! নানান খেয়াল আসতে লাগল মাথায়! সবাই এত একাকিত্বে ভোগে আর সবার সেলফ এস্টিম এত নিচু হয়ে আছে যে, দুটো ভাল কথা শুনলেই তার ওপর হামলে গিয়ে পড়ে। আরে বাবা আগে দেখ, যে এমন করে মিষ্টি কথার বান ডাকছে, সে কতটা সত্যি বলছে আর কতটা সে নিজের ধান্দা গোছানোর চেষ্টা করছে! তা নয় একদম ল্যাজেগোবরে হয়ে যায়! কমন সেন্স জিনিসটাই যেন আজকাল আনকমন হয়ে গিয়েছে।

মিতালির এই সম্পর্কটা চলছে প্রায় বছরখানেক ধরে। দু’জনে সবাইকে লুকিয়ে ইতিমধ্যে হিমাচল ঘুরে এসেছে, অরুণাচল প্রদেশ ঘুরে এসেছে। কিন্তু তার মধ্যে কুমার যখনই নিজের বউ-বাচ্চাকে নিয়ে ঘুরতে যায়, ব্যস, মিতালির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

ব্যাঙ্কের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মাখন বলল, “দিদি, কিছু কাজ থাকলে আপনি আমায় দিন।”

ইলা ডিপোজিট স্লিপসহ চেকটা দিল মাখনের হাতে। বলল, “এটা জাস্ট ড্রপ করে দিয়ো।”

মাখন মাথা নেড়ে চলে গেল।

মিতালি তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, “আমি কি সুইসাইড করব? তা হলে কি কুমার বুঝবে আমার কষ্ট?”

ইলার মনে হল, পা থেকে জুতো খুলে মারে মিতালিকে। শালা, মাজাকি পেয়েছে! বাপের টাকার অভাব নেই। রোজগারের চিন্তা নেই। কোনও দায়দায়িত্ব নিতে হয় না। বছরে দু’বার বিদেশে যায় ছুটি কাটাতে। সে নাকি সুইসাইড করবে!

ইলা চোয়াল শক্ত করে নিজেকে সামলাল। তারপর হেসে বলল, “এসব কেউ ভাবে? ওসব ভাবিস না। আমি তো আছি। দরকারে আমায় বলবি কষ্ট হলে। কেমন?”

“তুই তো আছিস,” মিতালি ওকে জড়িয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল। তারপর জড়িয়ে-মড়িয়ে কী বলল কে জানে!

ইলা বুঝতে পারছে মিতালির চোখের জলে নাকের জলে ওর ড্রেসটার বারোটা বাজছে। ইস, কী যে করবে!

ও মিতালিকে ঠেলে সরিয়ে হাসল। তারপর বলল, "লেটস টক সামথিং এলস। আচ্ছা, মানবদার সেই ক্যাফের কী কেস? কতদূর হল?"

মিতালি চোখ মুছল। ইলা দেখল মাখন এসে বসল গাড়িতে।

ইলা বলল, "আলিপুর যাব মাখন। হর্টিকালচারের কাছে।"

মাখন মাথা নাড়ল। তারপর গাড়ি স্টার্ট দিল।

মিতালি নাক টেনে বলল, "দাদার প্রজেক্ট অন আছে। শুধু ওই স্পেস নিয়ে কী একটা প্রবলেম হচ্ছে। আসলে আমি মাথা দিতে পারছি না। কুমারদের বার্নের ছবি দেখে আমার মনটা এত খারাপ হয়ে গেল! জানিস ওরা ইন্টারলাকেন-এ প্যারাগ্লাইডিং করেছে! হেসে হেসে ছবি দিয়েছে! আমি দেখিস কী করি এবার। ও এলেই আমি ব্রেক-আপ করে নেব। কোনও কথা শুনব না। একদম শুনব না।"

সারা পথ হাবিজাবি বকতে বকতে এসে আলিপুরে ইলাকে নামিয়ে চলে গেল মিতালি।

ইলা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এইসব মেয়েরা কোনওদিন শান্তি পাবে না!

ও ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা আয়না বের করে দেখল নিজের মুখটা। একটা লিপগ্লস বের করে আলতো করে বুলিয়ে নিল ঠোঁটে। তারপর মনটাকে শক্ত করল। ঘাবড়ালে চলবে না, কেরিয়ারের ব্যাপার।

একটা বাড়ির দোতলায় বিজন দাসের একটা ফ্ল্যাট আছে। সেখানে আজ বিজন ওকে দেখা করতে বলেছে।

আসলে ঠিক বিজন বলেনি। ইলাই জোর করে সময় চেয়ে নিয়েছে।

মিতুল যে-ফিল্মটা করতে চলেছে সেটা কমার্শিয়াল ছবি। আর এরকম ছবিই করতে চায় ইলা। ওসব সো-কলড প্রিটেনশাস আর্ট ফিল্ম দেখলে ওর গা জ্বলে যায়!

কিন্তু এই ফিল্মে ও নাকি সেকেন্ড লিড! মানে, দ্বিতীয় হিরোইন হয়ে থাকবে? সেটা কী করে সম্ভব! দুটো গান। চারটে ডায়ালগ আর ভিলেনের একটা রেপ অ্যাটেম্পট। এই জন্য ও এসেছে নাকি!

মিতুলকে বলতে গিয়েছিল একবার। মিতুল পাত্তাই দেয়নি। বরং এটা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, এভাবে বললে ওকে বাদ দিয়ে দেবে ছবি থেকে। তাই আসল জায়গায় বলতে হবে। বিজন যদি মিতুলকে বলে, তা হলে মিতুল ওকেই লিড হিরোইন নিতে বাধ্য হবে।

ফ্ল্যাটের দরজার কাছে একটা চেয়ারে দেখল নমন বসে রয়েছে। ইলাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। হাসল।

বিরক্ত লাগল ইলার। এত গায়ে-পড়া না এই ছেলেটা! কেন যে মরতে ওকে কথা বলতে ইন্ডালজ করেছিল!

এই যে ও ফিল্মে চান্স পেয়েছে, সেই খবরটা ফোনে দেওয়ার সময়ও ইনিয়েবিনিয়ে কত কথা! যেন ওর জন্য ইলা চান্স পেয়েছে। একবার ফিল্মটা লাগুক না। তারপর একদিন এমন ইগনোর করবে যে বুঝবে! সামান্য লজ্জা থাকলে আর সামনে আসবে না কোনওদিন। হাড়হাভাতে যত!

"তুমি এখানে!" নমন জিজ্ঞেস করল।

“দরকার আছে,” ইলা আজ আর বিরক্তিটা লুকোল না, “বিজনবাবু ডেকেছেন আমায়। খুব জরুরি দরকার।”

“ও! স্যার বলেছিলেন বটে যে, একজন আসবে। সেটা যে তুমি বুঝিনি,” নমন অপ্রস্তুত হল।

“এখন তো বুঝলে? তা হলে আমি ভেতরে যাই?”

“শিওর, প্লিজ,” নমনের যেন হুঁশ হল। দরজাটা খুলে সরে দাঁড়াল। বলল, “ভেতরে সুমিদি আছে। স্যারের সেক্রেটারি। উনি...”

“জানি,” ইলা আর দাঁড়াল না। দরজা ঠেলে সোজা ঢুকে গেল ভেতরে।

সুমি মহাপাত্র বিজনদার সেক্রেটারি। খুব ধুরন্ধর মহিলা। কম কথা বলে। আর সময়ে সময়ে বেশ রাগীও বটে।

আজ ওকে দেখামাত্র পাশের একটা ঘর দেখিয়ে দিল। বলল, “দাদা ওপরে আছেন। আসছেন। ওখানে একটা সিরিয়ালের এডিটিং চলছে। তুমি বোসো।”

বিজনের প্রোডাকশনের দুটো সিরিয়াল চলছে এখন। এই ফ্ল্যাটের ওপরের ফ্লোরেই একটা সেট-আপ আছে। সেখানে এডিট হয় বলে জানে ইলা।

চেয়ারে বসে আবার আয়না বের করে নিজেকে দেখল ইলা। ঠিক লাগছে তো? বিজনের রাজি হওয়াটা সবচেয়ে প্রয়োজন।

মিনিট দশেক পরে বিজন এসে ঢুকল ওর ঘরে। মুখে হাসি। একটা জিনসের ওপর পাঞ্জাবি পরেছে লোকটা।

ইলা উঠে দাঁড়াল।

“আরে বোসো, তুমি এখন হিরোইন। এভাবে উঠে দাঁড়াবে না। একটা গ্র্যাভিটি রাখবে। কেমন?” বিজন হেসে বসল বড় একটা সোফায়। তারপর বলল, “বলো, কী এমন আর্জেন্ট কথা।”

ইলা বলল, “স্যার, আপনি বললেন হিরোইন, কিন্তু আমি তো সেকেন্ড লিড। তাও স্ক্রিন টাইম আর কতটুকু! আপনি আমায় হেল্প করুন না!”

“আমি? আমি কী করব? আর এই চান্সও কেউ পায়? পায় না,” বিজন হাসল।

“স্যার প্লিজ, আমি ডেসপারেট,” ইলা বিজনের চোখে চোখ রেখে দাঁত দিয়ে আলতো করে ঠোঁট কামড়ে তাকাল।

বিজন স্থিরভাবে তাকাল ইলার দিকে। তারপর কেটে কেটে জিজ্ঞেস করল, “হাউ ফার?”

ইলা চোয়াল শক্ত করল। ব্যাগটা পাশে রেখে হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল বিজনের কাছে। আলতো করে হাত রাখল বিজনের হাঁটুতে। ডান হাত দিয়ে বিজনের পাঞ্জাবিটা তুলে প্যান্টের চেনে হাত দিয়ে বলল, “অল থ্রু।”

বিজন হাতটা ধরে থামাল ইলাকে। তারপর বলল, “যা বলছ ভেবে বলছ তো?”

“হ্যাঁ স্যার। সিম্পল এক্সচেঞ্জ,” ইলা কৃত্রিমভাবে শ্বাস ঘন করে কথা বলার চেষ্টা করল।

বিজন ইলাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, “সিট প্রপারলি। যা বললে মনে থাকে যেন। আমি মিতুলকে যা বলার বলে দেব। কিন্তু তোমাকেও কথা রাখতে হবে। যা বলব, করতে হবে। বুঝেছ?”

মিতুলকে বলবে বিজন। মানে ও ফার্স্ট হিরোইন! ওঃ, দারুণ ব্যাপার!
ইলা আর কিছু ভাবল না। হাসিমুখে বলল, “ডান।”

নয়

রেমি বলল, "তোমায় ধরে কেউ কোনওদিন পেটায়নি, না?"

সাজু হাসল। মেয়েটা বড্ড ছটফটে। হাতে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট নিয়ে ঘোরাচ্ছে এখন। এতক্ষণ দু'সেট ম্যাচ খেলতে হয়েছে ওকে। চল্লিশ বছর বয়স হল ওর, এখন কি আর এত দৌড়ঝাঁপ পোষায়?

আজ মেঘ করে আছে। এতক্ষণ হাওয়া দিচ্ছিল না। কিন্তু এবার, শেষ বিকেলের দিকে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ভাল লাগছে এইদিকে বসে থাকতে। একটু দূরেই পুকুর। হাওয়ায় পুকুরের জলে এমন করে ভাঁজ পড়ছে যে, মনে হচ্ছে দুষ্টু বাচ্চা বেড কভার কুঁচকে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু হাওয়া বাড়লে কী হবে? সাজুর চিন্তা হল। পুকুরের ওইদিকে ঝুঁকে পড়া গাছটায় একটা বাবুইপাখি বাসা বানাচ্ছে। খুব বেশি হাওয়া দিলে সেটা যদি ভেঙে পড়ে! নষ্ট হয়ে যায়!

পাখিটা আনাড়ি ধরনের। বেশ কিছুদিন ধরে দেখছে সাজু। কিছুতেই যেন বাঁধতে পারছে না বাসা! তাও এতদিন পরে আজ একটু একটু করে আকার নিচ্ছে। সেটাও যদি ভেঙে পড়ে!

আলেসান্দ্রো বলে, "তোমার প্রবলেম কী জানো? ইউ কেয়ার টু মাচ। যে তোমায় চেনেও না তার বেলাতেও তুমি বড্ড কেয়ার করো। এটা ঠিক নয়। লোকে এমন সব মানুষের কাছ থেকে সুবিধে নেয়। তাদের নিজেদের স্বার্থে খাটিয়ে নেয়। স্টপ কেয়ারিং অ্যাবাউট ইউজলেস থিংস। ইট উইল ড্রাই ইউ আউট। লিভ ইউ লোনলি।"

লোনলি! একা! তাই কি ওর জীবন এমন হল?

সাজু পুকুরের ওইদিকে তাকাল। বাবুইপাখির বাসার ছোট্ট একটা কাঠামো দুলছে গাছের ডালে। পাখিটা নেই। কোথায় গিয়েছে কে জানে!

সেই প্রথম থেকেই মেমদিদার বাড়িতে এসে এই বাগানে, পুকুরের ধারে বসে থাকতে খুব ভাল লাগত সাজুর। তখন একটু-আধটু লেখার অভ্যেস ছিল। মাঝে মাঝে টুকটাক লিখত। ছবিও আঁকত। আর সব কিছু পণ্ড করে দিত লাবণ্য।

লাবণ্যকে জ্ঞান হওয়া থেকেই চেনে সাজু। একদম তুই-তোকারির সম্পর্ক। দু'বছরের ছোট ছিল লাবণ্য। কিন্তু ভাব করত এমন, যেন কত বড়!

মেমদিদার কথায় অঙ্কটা সাজুকেই দেখিয়ে দিতে হত। আর সেই অঙ্ক করাতে বসেও মেয়ের কত খবরদারি!

সাজুর মনে আছে, তখন ও সদ্য ইলেভেনে উঠেছে। বয়েজ স্কুল থেকে গিয়ে ভর্তি হয়েছে কো-এডুকেশন স্কুলে। অনেক নতুন বান্ধবী হয়েছে। তারা আসছেও বাড়িতে দেখা করতে। তাদের সঙ্গে কোচিংয়েও যাতায়াত হচ্ছে। আর এসবের মধ্যে সাজু বলেও দিয়েছে যে, লাবণ্যকে আর অঙ্ক করাতে পারবে না। কারণ, লাবণ্য নাইনে পড়ে। ওর সামনে মাধ্যমিক। ভাল কোনও প্রফেশানাল টিচার দরকার ওর।

তারপর এক রবিবার বিকেলে এমনি এই বাড়িতে এসেছিল সাজু। মেমদিদার সঙ্গে দেখা করে উঠে গিয়েছিল ওদের চারতলার ছাদে। ওখানে লাবণ্যর পড়ার ঘর ছিল তখন।

আসলে ও ভেবেছিল, প্রায় দশদিন হয়ে গেল মেয়েটার সঙ্গে দেখা নেই। কী করছে একটু দেখে আসে।

বিকেলের আলো থাকলেও পরদা-টানা পড়ার ঘরে একটা ছোট্ট টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল। আর সেই আলোয় বসেছিল লাবণ্য। মাথা নিচু। পেছন থেকে লাবণ্যকে পড়তে দেখে সামান্য অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল সাজু। ভেবেছিল, মেয়েটা এখন পড়ছে, ওকে কি ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে?

সাজু মাথা নামিয়ে চলে আসছিল। আর ঠিক তখনই লাবণ্যর গলার আওয়াজ পেয়েছিল, "খুব ব্যস্ত, না? কথা না বলেই চলে যাচ্ছিস?"

সাজু থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে ঘুরে দেখেছিল লাবণ্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"না, ভাবলাম তুই পড়ছিস। তাই..." সাজু কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

"খালি অজুহাত। কী করে আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে তার ধান্দা! আর স্বাভাবিক। সে তো হবেই," লাবণ্য ঠোঁট টিপে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

"মানে? কী হবে?" সাজু বুঝতে পারছিল না।

লাবণ্যর ঠোঁট কাঁপছিল। মুখ লাল হয়ে উঠছিল। সাজু বুঝতে পারছিল না কী হচ্ছে ব্যাপারটা। মেয়েটা এমন করছে কেন? এমনিতে তো সারাক্ষণ ওকে দূর-ছাই করে। বকাবকি করে। দু'মিনিট অন্তর বলে, "বাড়ি যা তো, বাড়ি যা," আজ সে এসব কী বলছে?

লাবণ্য বলেছিল, "আমার কাছে এখন আসবি কেন! নীল সাইকেল, গোলাপি সাইকেল আসে বাড়িতে। তাদের সঙ্গে কত হা হা কত হি হি! একজন জামার কলার ঠিক করে দিচ্ছে। আর-একজন হাত ধরে টানছে। এক কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল থেকে দু'জনে খাচ্ছে! আমি কি দেখিনি কিছু, আমি কি বুঝি না!"

কথা বলতে বলতে লাবণ্যর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

"আরে, আরে... তুই কাঁদছিস কেন?" সাজু কী করবে বুঝতে পারছিল না। ও এগিয়ে গিয়েছিল লাবণ্যর কাছে।

"সরে যা, সরে যা," লাবণ্য এক ধাক্কা মেরেছিল সাজুকে। আর সাজু টাল সামলাতে না পেরে ঘরের অন্যদিকে রাখা একটা ছোট্ট সিঙ্গল খাটের ওপর পড়ে গিয়েছিল। মাথাটা লেগেছিল খাটের কোনায়। শব্দ হয়েছিল বেশ।

লাবণ্য থমকে গিয়েছিল। তারপর এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়েছিল ওর ওপর। বলেছিল, "কী হল? লাগল? বেশ হয়েছে। আরও মারব... মেরে শেষ করে দেব তোকে। একদম শেষ।"

লাবণ্য এলোপাথাড়ি হাত চালাতে চলাতে উঠে এসেছিল ওর ওপর। আর নিজেকে বাঁচানোর জন্য হাত তুলে আত্মরক্ষা করছিল সাজু। তারপর আচমকা থেমে গিয়েছিল লাবণ্য। হাঁপাচ্ছিল ও। ওর ছোট করে কাটা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল সামান্য। একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সাজুর দিকে। সাজু বুঝতে পারছিল না কী করবে।

লাবণ্য হঠাৎ জামার বুকের কাছটা খামচে ধরেছিল সাজুর। এক টানে নিয়ে এসেছিল নিজের কাছে। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিল ওর। দাঁত দিয়ে আলতো করে কামড়েছিল জিভে। তারপর ঠোঁট ছেড়ে দিয়ে ওর

বুকে মুখ গুঁজে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল।

সাজুর মাথা ঘুরছিল। কান দিয়ে আগুন বেরচ্ছিল। ও কী করবে বুঝতে পারছিল না। লাবণ্য নিজেই সাজুর হাতটা ধরে ওর পিঠে জড়িয়ে দিতে দিতে বলেছিল, "অন্য মেয়েদের কাছে গেলে না ওই পুকুরে ডুবিয়ে মারব। কুচি কুচি করে কেটে ডালকুত্তাকে দিয়ে খাওয়াব। গলা টিপে শেষ করে দেব। বুঝেছিস?"

সাজু আলতো করে জড়িয়ে ধরেছিল লাবণ্যকে। ওর মনের মধ্যে লাবণ্যের প্রতি যে-ভালবাসা লুকিয়েছিল, সেটাই বেরিয়ে এসেছিল মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসার মতো। আর ও ভেবেছিল, একটা মানুষকে আর কতভাবে মারা যায়?

কতভাবে নয় একভাবেই মারা যায়। আর সেটা লাবণ্যই দেখিয়ে দিয়েছিল সেই পনেরো বছর আগে, সেই আলোছায়ার চিলেকোঠাতেই।

"তোমাকে না মেরে পাট পাট করে দেওয়া উচিত। পুকুরে ডুবিয়ে মারা উচিত!" রেমি আবার ঝংকার দিল।

হাতের র‍্যাকেটটা রেখে হাসল সাজু। সত্যি কিছু জিনিস পালটায় না।

মেয়েটা খুব খড়খড়ে। সারাক্ষণ কথা বলে। সেইদিন যে মেমদিদা আলাপ করিয়ে দিল, তারপর থেকে একদম পেছনে লেগে রয়েছে সাজুর। মাঝে মাঝে তো ওদের বাড়িতেও চলে যাচ্ছে। ওর খাটে উঠে মোবাইল নিয়ে খেলছে। ওর পুরোনো বইপত্তর ঘাঁটছে। আর কত কী যে বলে যাচ্ছে!

রেমির কাছ থেকেই সাজু জেনে গিয়েছে যে, ওরা এখন পুণেতে থাকে। সেখানে অশোক মানে, রেমির বাবা একটা সফটওয়্যার ফার্মের বড়সাহেব। জেনেছে, অশোক ইউএস-এ গিয়েছে বলে আসতে পারেনি ওদের সঙ্গে। রেমি নিরন্তর কথা বলে যায় পপকর্ন ফোটার মতো করে। খুব ভাল লাগে সাজুর।

"কেন, আমি কী করলাম যে তুমি আমায় মারবে?" সাজু জিজ্ঞেস করল।

রেমি বলল, "এই কারণেই তো, এই একটা কারণেই তো। সেদিন থেকে আমায় 'তুমি তুমি' করে ডাকছ। আরে বাবা, সাহেবের দেশে থাকো, সেখানে সবাই 'ইউ' বলে, তাই তুমি এখানেও আমায় 'তুমি তুমি' করে যাবে? তুই বলতে হয় জানো না?"

সাজু হাসল, "আমি ছোটদের তুই বলি না।"

"আমার মাকে যে বলো! মা তো তোমার চেয়ে ছোট। দু'বছরের। তাই না? তা হলে?"

সাজু হাসল আবার, "পয়েন্ট আছে তোমার কথায়। আসলে লাবণ্যকে আমি তো ছোট থেকে চিনি। তাই আর কী। প্লাস ও আমায় তুই করে বলে।"

রেমি বলল, "আমিও তো ছোট। আমাকেও তো ছোট থেকে চিনছ। তবে? খালি ঢপবাজি!"

"আরে!" সাজু চোখ গোল করল, "এসব আবার কী কথা!"

"কেন, খুদেদা সেদিন ফোনে যেন কাকে বলছিল। ঢপবাজি মানে মিথ্যে কথা। আমি জানি," রেমি হাসল।

সাজু বলল, "ঠিক আছে। তবে এসব বোলো না। ভাল কথা নয়, কেমন?"

রেমি ভুরু কুঁচকে বলল, "আমি প্রায় ফোরটিন। আমি কত গালি জানি জানো? ফাক, শিট, বলস আরও কত্ত কী জানি! জানো, আমার বয়ফ্রেন্ডও আছে। নিরজ। ও ক্লাস টেন-এ পড়ে। এখনও কিস করতে দিইনি।

বলেছি বোর্ডের এগজ্যাম না-দিলে আমি কিস করব না। ঠিক না বলো! আর তুমি আমায় বলছ এসব খারাপ কথা!"

"আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে," সাজু হাতজোড় করে বলল, "তুমি চুপ করো মা। আমি বুঝেছি তুমি বিশাল বড় হয়ে গিয়েছ! কিন্তু আমি তো বড় হইনি, তাই এসব নিতে পারছি না।"

"আমি জানি তুমি বড় হওনি," রেমি বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল।

"কে বলল?" সাজু অবাক হল।

রেমি বলল, "মা কালকে মেমদিদাকে বলছিল, সাজুটা এখনও ছোটদের মতোই রয়ে গেল। জানো, একা একা দাঁড়িয়ে বাবুইপাখির বাসা বানানো দেখে।"

লাবণ্যর সঙ্গে দু'-একবার কথা হয়েছে ওর। তাও বেশি কিছু না। এই সামান্য 'কেমন আছিস' ধরনের। আসলে কী আর বলবে সেটা বুঝতে পারে না সাজু। কারণ, পনেরো বছর আগে সেই চিলেকোঠাতেই জীবনের সব কথা শেষ করে দিয়েছে লাবণ্য। আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

"রেমি, এই রেমি তোর মা ডাকছে।"

সাজু দেখল টুপু আসছে এদিকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অফিস থেকে ফিরেছে একটু আগে।

রেমি বেশ বিরক্ত হল। মা ডাকা মানেই কিছু একটা কাজ করতে হবে। সাজুর সঙ্গে যেভাবে ও থাকে সেভাবে তো আর কারও কাছে থাকতে পারে না।

রেমি বলল, "তোমার কাছেই আমি ভাল থাকি, জানো! এই যে মা ডাকছে, গেলেই বলবে পড়তে বোস। আচ্ছা, দাদু-দিদার বাড়িতে এলে কেউ পড়াশোনা করে? বই নিয়ে আসে? সাজু আঙ্কেল, তুমি একটু মাকে বলে দেবে?"

সাজু হাসল, "তোমার মা যে কারও কথা শোনে না। তুমি যাও, গিয়ে দ্যাখো মা কী বলছে! কেমন?"

রেমি নিজের আর সাজুর র‍্যাকেটটা নিল। সাজু মাটিতে পড়ে থাকা ফেদারটাও দিয়ে দিল। হাসল। তারপর হাত নাড়িয়ে টা-টা করল।

রেমি বিরক্ত আর অনিচ্ছুক পায়ে বাড়ির দিকে চলে গেল।

সাজু উঠল।

"ও, আমায় দেখেই উঠে পড়ত হল?" টুপু এসে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

সাজু হাসল, "আরে, না না... এমনি," তারপর বসে পড়ল আবার।

আসলে টুপুকে কী বলবে, বোঝে না সাজু। ছোটবেলায় দেখত ওকে। খুব একটা কথা বলত না। ভুলেও গিয়েছিল ওর কথা। এখানে এসে দেখল, আরে টুপু যে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে! ভাল চাকরি করছে!

"কী এমনি?" টুপু মাটিতে বসে পড়ল ওর পাশে। তারপর বলল, "তুমি আমায় এড়িয়ে যাও কেন?"

"আমি!" সাজু অবাক হল, "এড়িয়ে যাই মানে?"

"মানে, আমায় দেখলে কথা বলো না। কেন?" টুপু এখনও ভুরু কুঁচকে আছে।

সাজু কী বলবে ভেবে পেল না। এই বাড়ির মেয়েদের রক্তে কি শুধুই রাগ আছে!

টুপু আবার বলল, "দ্যাখো, এখনও কেমন করছ! আমি কি রাক্ষস?"

"কী সব বলো!" সাজু হালকা গলায় বলল, "তা, তোমার চাকরি কেমন চলছে?"

"তুমি জেনে কী করবে?" টুপু রাগের গলায় বলল।

সাজু হাসল, "তা ঠিক। তা তোমার কোনও বয়ফ্রেন্ড? আছে?"

টুপু উত্তর না-দিয়ে বলল, "তোমার কি কোনও গার্লফ্রেন্ড আছে? ইটালিয়ান?"

সাজু মাথা নাড়ল, "না নেই।"

"মানে, দিদির পরে আর কারও সঙ্গে প্রেম হয়নি?" টুপু সোজা তাকিয়ে আছে।

সাজু চোখ সরিয়ে নিল। তারপর মাথা নাড়াল।

"সে কী! এখনও দিদির প্রেমে পড়ে আছো?"

"না, আর প্রেম নেই!" সাজু বলল ছোট্ট করে।

"শিওর?" টুপু তাকাল ওর দিকে।

"সেই বয়সটাই নেই। তা ছাড়া লাবণ্য সেই কবে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর কয়েক বছর কষ্ট ছিল। কিন্তু আর নেই। জীবন আস্তে আস্তে সব ঠিক করে দেয়। এই আর কী!"

"তোমার কি ঘুম হচ্ছে না?" টুপু আবার প্রসঙ্গ পালটাল, "চোখের তলায় ডার্ক সার্কেল পড়ছে।"

"আরে, ঠিক লক্ষ করেছ তো!" সাজু অবাক হল, "হ্যাঁ, ঘুম হচ্ছে না। কেন কে জানে! সারা দিন ঘুম ঘুম পায়, কিন্তু রাতে শুলেই আর ঘুম নেই!"

"হ্যাঁ, আমি লক্ষ করেছি," মাথা নাড়ল টুপু। বলল, "তোমার একটা লাল সাইকেল ছিল। একটা রাস্ট কালারের পাঞ্জাবি ছিল। তুমি ডান হাতে একটা সবুজ পাথরের আংটি পরতে। পুরনো বাংলা গানের খুব ভক্ত ছিলে। টম হ্যাঙ্কসের ছবি এলেই দেখতে যেতে। আর ক্যারম খেলতে খুব ভাল। কার্টুন আঁকতে। আর... আর... টিনটিনের সব বই ছিল তোমার। পুরনো কয়েন জমাতে। আর ছিল টুপির শখ। ঠিক না?"

সাজু অবাক হয়ে গেল। তারপর হাতজোড় করে প্রণাম করে বলল, "আপনি মানবী নন, দেবী! আমায় আশীর্বাদ করুন যাতে আমারও জীবনে কিছু হয়!"

"ধেৎ," টুপু এই প্রথম হেসে হাতের কাছে পড়ে থাকা একটা ছোট্ট গাছের ডাল ছুড়ল ওর দিকে। তারপর বলল, "তুমি তো আমাদের বাড়ির দিকটায় যাওনি। আসবে? আমার বাবা-মাও তো আছে। তারাও জিজ্ঞেস করছিল তোমার কথা। তুমি তো কেবল মেমদিদা আর লাবুদিকে দেখে চলে যাও।"

সাজু বলল, "কারেকশন। শুধু মেমদিদা। লাবণ্যর সঙ্গে কথা হয় না। কিছু কথা নেই তো!"

"স্টিল হার্ট?" টুপু তাকাল।

"নো, সারটেনলি নট!" সাজু বলল, "ওসব কিচ্ছু না। আমাদের লাইফ তো আলাদা হয়ে গিয়েছে। সেই সরযু আর নেই!"

"তো বিয়ে করোনি কেন?"

সাজু এবার চওড়া করে হাসল। বলল, "এই রে, সত্যি তো! ভুলে গিয়েছি একদম!"

"আবার!" টুপু এবার আর কিছু না-পেয়ে হাতের মোবাইলটা তুলল।

"আরে, ওটার দাম মিনিমাম চল্লিশ হাজার টাকা। ওটা দিয়ে মার খাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই," সাজু প্রাণ খুলে হাসল এবার।

টুপু নিজেকে সামলাল। তারপর নিচু গলায় বলল, "সবজান্তা!"

সাজু ঘড়ি দেখল। ছ'টা বেজে গিয়েছে। চারদিকে আলো কমে এসেছে অনেক। মেন গেট থেকে বাগানের মধ্য দিয়ে বাড়ি অবধি যে-রাস্তাটা গিয়েছে, তার দু'দিকে আলো লাগানো আছে। কিন্তু ঝলমলে আলো নয়। খুব সুদিং, নরম আলো।

ইউরোপে থাকতে থাকতে একটা জিনিস দেখেছে সাজু। ওখানে শহরে আলো লাগানোর ব্যাপারটা একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে ওরা। সরাসরি কোনও আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না। সবটাই খুব শৈল্পিকভাবে করা। আলোছায়ার যে একটা মাধুর্য আছে, সেটা ওখানে না গেলে বুঝতে পারত না সাজু।

মেমদিদাও সেভাবেই আলোয় সাজিয়েছে বাগানের মধ্যে রাস্তাটার দু'পাশ। দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়।

সাজু এবার উঠল।

"এখন যাবে আমাদের বাড়ি?" টুপু তাকাল ওর দিকে। কিন্তু সাজু কিছু বলার আগেই শুনল গেটের কাছ থেকে 'মামু' বলে একটা ডাক এল।

ও ঘুরল। দেখল, আলো-আঁধারির মধ্যে বিনি আসছে। কিন্তু ওর হাঁটার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার আছে যে, বুঝল কিছু একটা হয়েছে।

সাজু এগিয়ে গেল বিনির দিকে। টুপুও এল পাশে।

"কী রে?" সাজু দেখল বিনি হাঁপাচ্ছে।

"তুমি আবার মোবাইল বাড়িতে ফেলে এসেছ! এদিকে মা তোমায় ফোন করে যাচ্ছে। প্লিজ, বাড়ি চলো।"

"কিছু হয়েছে?" সাজু একটু অবাক হল। এই অল্প আলোতেও বিনির নার্ভাস মুখটা দেখল।

বিনি সামান্য কাঁপা গলায় বলল, "ওই... ওই শয়তান লোকটা আবার এসেছে!"

দশ

রবিবারগুলো কেন যে সপ্তাহে একবারই আসে কে জানে! আজকাল আর যেন কাজ করতে ইচ্ছে করে না টুপুর। চৌত্রিশ হল ওর। সেই চব্বিশ বছর বয়স থেকে চাকরি করছে। আসলে করতেই হয়েছে। সেই সময় ওদের এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে, উপায় ছিল না কিছু।

এখনও মনে আছে টুপুর। বাবা বড় চাকরিই করত। প্রাইভেট কোম্পানি ছিল সেটা। বাবার ডিপার্টমেন্ট ছিল পারচেজ। সেখান থেকে একদিন আচমকাই বাবার চাকরি চলে যায়। কারণ, ওর বাবা কোম্পানির তহবিল তছরুপ করেছিল।

খবরের কাগজে উঠেছিল ব্যাপারটা। চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেও সময় লাগেনি। সে যে কী কষ্টের সময় ছিল! বাড়ি থেকে মাস দুয়েক বেরতে পারেনি টুপু। ওর মা সারা দিন কাঁদত। আর বাবা কারও সঙ্গে কথা না বলে একা একটা ঘরে বসে থাকত।

টুপুর মনে আছে, মা একদিন জুতো দিয়ে প্রচণ্ড মেরেছিল বাবাকে! কাঁদতে কাঁদতে মায়ের হুঁশ ছিল না। পায়ের জুতো খুলে বাবার পিঠে মাথায় সর্বাঙ্গে সপাসপ করে চালিয়েছিল মা।

বাবাকে সবচেয়ে ভালবাসত টুপু। কিন্তু সেই লোকটার এমন অধঃপতন দেখে ও কী করবে বুঝতে পারেনি। এত কষ্ট হত! মনে হত, ওকে যা কিনে দিয়েছে বাবা, যেখানে যেখানে ঘোরাতে নিয়ে গিয়েছে, যা খাইয়েছে সব তা হলে বেইমানির টাকায়! যে-বাবা ওকে সারা জীবন বলে এসেছে সৎ থাকতে, ভাল হয়ে থাকতে, সেই লোকটাই আসলে চোর! ও একটা চোরের মেয়ে!

রাতে ঘুমোতে পারত না টুপু। নিজের ঘরে শুয়ে কাঁদত। আর মাঝে মাঝে শুনত মা অকথ্য গালাগালি দিচ্ছে বাবাকে। আর বাবা কেমন যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইছে।

যে-কোম্পানিতে চাকরি করত বাবা, তারা লিগাল নোটিস পাঠিয়েছিল যে, বাবা যদি কোম্পানির তহবিলে তিরিশ লাখ টাকা জমা না-করে তা হলে ওরা বাবার নামে কেস করবে ও অন্যান্য লিগাল অ্যাকশন নেবে। আর বাবা যেন ভুলে না যায় যে, ওদের হাতে অনেক প্রমাণ আছে বাবার বিরুদ্ধে।

বাবা জানত, কেস হলে ওরা শেষ হয়ে যাবে। তাই জীবনের প্রায় সমস্ত সঞ্চয় খুইয়ে কোম্পানির খাতে জমা করেছিল টাকা। তাতে মায়ের গয়নাগাটিও চলে গিয়েছিল সব।

আর সেদিন রাতেই অফিস থেকে ফিরে বাবা গলায় দড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

রাতে বাথরুমে যাবে বলে উঠেছিল টুপু। দেখেছিল বাথরুমের দরজা বন্ধ। কিন্তু ভেতর থেকে কেমন একটা ঝটপটানির শব্দ আসছে। আর তার সঙ্গে কেমন একটা গোঙানির শব্দ।

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল টুপু। বুঝেছিল, কিছু না করলে একটা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

টুপু আর দেরি করেনি। সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা মেরে ছিটকিনি ভেঙে ফেলেছিল বাথরুমের দরজার। আর দেখেছিল, তাদের পুরনো দিনের বাড়ির উঁচু শাওয়ারের ওপরের লোহার পাইপ থেকে একটা নাইলনের দড়ির

ফাঁস গলায় দিয়ে ঝুলছে বাবা।

টুপু কেঁপে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য। তারপর দৌড়ে গিয়ে বাবার পা দুটো তুলে ধরেছিল আর প্রচণ্ড চিৎকার করে ডেকেছিল মাকে।

মা দরজা ভাঙার আওয়াজে উঠেই গিয়েছিল ঘুম থেকে। এবার বাথরুমে ঢুকে ওই অবস্থা দেখে কী করবে বুঝতে পারেনি প্রথমে। থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। আর কাঁদছিলও খুব।

টুপু ধমক দিয়েছিল জোরে। বলেছিল, "বাবার গলার ফাঁস খোলো, খোলো আগে!"

বাবাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পুলিশ কেসও হয়েছিল।

বাড়িটা যেন নরক হয়েছিল সেই সময়ে। বাবার শারীরিকভাবে সুস্থ হতে সময় লেগেছিল বেশ। তারপর ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিল বাবা। সেই চিকিৎসার খরচ, সংসারের খরচ, সব মিলিয়ে সে যে কী সাংঘাতিক একটা কষ্ট!

মাস্টার্সের পরে আরও পড়ার ইচ্ছে ছিল টুপুর। কিন্তু হয়নি। কারণ, সংসার চালানোটাই একটা ঝক্কি হয়ে গিয়েছিল। তাই চাকরি নিতে হয়েছে ওকে। প্রথমে একটা কোম্পানিতে ঢুকেছিল। পরে নতুন চাকরি নিয়ে এইখানে আছে।

মাঝে দশটা বছর কোথা দিয়ে যে চলে গেল! সারাক্ষণ শুধু কাজ আর কাজ। টাকা রোজগার। আগে কী ভাল গান গাইত টুপু। বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আঁকতে পারত, সেটাও কবে ছেড়ে দিয়েছে। জীবনে আর কিছু নেই। অফিস। রোজগার। বাড়ি। মাঝে মাঝে মানবের সঙ্গে সময় কাটানো। সেক্স। ব্যস, এইটুকুই। ভাল লাগে না একদম। সেই লাজনি যে কোথায় হারিয়ে গেল! মানবের সঙ্গেই-বা কেন আছে ও? কীসের জন্য? চাকরির জন্য কি! মোহিতস্যার রাগ করবেন ও যদি মানবের সঙ্গে ব্রেক-আপ করে নেয়? এত টাকার চাকরি, দরকারমতো অফিসের গাড়ি, হলিডে অ্যালাউয়েন্স— সব বন্ধ হয়ে যাবে! এটাই কি ভয়? নিজেকে কি এভাবেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে ও? সেদিন ও না বলা সত্ত্বেও মানব যা করল ওর সঙ্গে, সেদিনই তো ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত ছিল টুপুর। সব সম্পর্ক শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পারেনি।

তবে পারতে হবে। টুপুর মন বলছে, ওকে পারতেই হবে। ওই লোকটা ফেরত আসার পর থেকে আরও যেন মনে হচ্ছে এসব।

সেই কিশোরী বয়সে তো ওই লোকটাকেই ভাল লাগত ওর। লাবুদির সঙ্গে প্রেম ছিল বটে। কিন্তু মনে মনে ও নিজেও কি প্রেমে পড়েনি! লাবুদির কাছ থেকে চুরি করে লোকটার একটা অল্প বয়সের ছবি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল ও। আজও ওর ঘরে, টেবিলের ওপরে মোটা একটা বইয়ের ভাঁজে রাখা আছে সেই ছবিটা। মাঝে মাঝে দেখে টুপু।

ওদের বাড়িতে এলেই একবারের জন্য হলেও তার কাছে যেত টুপু। আর গন্ধ পেত। সেই ফুল আর কর্পূর মেশানো একটা গন্ধ। আর কী আশ্চর্য, এত বছর পরেও কী করে যেন সেই গন্ধটা এখনও একই রকম রয়ে গিয়েছে!

সেদিন বাগানে বসে কথা বলছিল ওরা। সেদিনও হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসছিল গন্ধটা। আর কেমন যেন করছিল টুপুর! লোকটা কেন এল! এলই যদি চলেই-বা যাবে কেন! আর কপাল দ্যাখো, লাবুদিকেও

এখনই আসতে হল!

লাবুদি খুব একটা কথা বলে না সাজুর সঙ্গে, তাও এমন দৃষ্টিতে তাকায়! সব বোঝে টুপু। ও তো বোকা নয়। খুব রাগ হয় ওর। লাবুদিই তো তাড়িয়ে দিয়েছিল সাজুকে। তবে এখন ওভাবে তাকানোর কী আছে!

"টুপু, ক'টা বাজে দেখেছিস? উঠবি না? মানব যে চলে আসবে," মা দরজা খুলে ঘরে ঢুকল।

মা সকাল সকাল ওঠে। উঠে স্নান সেরে পুজো করে নেয়। তারপর একবার মেমদিদার কাছে যায়। সকালের চা-টা মেমদিদার সঙ্গেই খায়। ওদের সেই ভয়ংকর সময়ে মেমদিদাই একমাত্র পাশে ছিল ওর। মা সেটা ভোলেনি।

টুপু পাশ ফিরল। দেখল মায়ের চোখেমুখে টেনশন। আরে বাবা, মা কেন এত টেনশন করে কে জানে! আসলে টুপু বোঝে, বাবার ওই ব্যাপারটার পর থেকে এমন হয়ে গিয়েছে মা। সারাক্ষণ সিকিওরিটি নিয়ে ভাবে।

টুপু উঠে বসল বিছানায়। তারপর হাত দিয়ে চুলটা ঠিক করে নিয়ে বলল, "তুমি এত চাপ কেন নাও! আসবে তো কী! আর এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে।"

"তাও তোকে তো রেডি হতে হবে," মা সামনে এসে বিছানার চাদর, বালিশ ঠিক করতে শুরু করল। বলল, "তোরা যে ফ্ল্যাট দেখতে যাবি সেটা তোর বাবাকে বলব?"

"হ্যাঁ বলবে। না বলার কী আছে!" টুপু বিছানা থেকে নেমে পায়ে স্লিপার গলিয়ে আয়নার সামনে গেল। ভাল করে দেখল নিজেকে।

মা বলল, "না মানে, জানিস তো কেমন হয়ে থাকে!"

টুপু বলল, "তুমি এখনও যদি কথায় কথায় ঠেস দাও, তবে তো অমন কুঁকড়ে থাকবেই! তাই না? তুমি অমন করে কথা বোলো না। যা হয়ে গিয়েছে তা তো আর পালটাবে না। শুধু শুধু বাবাকে কষ্ট দেওয়া কেন?"

মা বালিশটা ঠিকমতো রেখে, এসির রিমোটটা তুলে বন্ধ করে দিল এসিটা। তারপর বলল, "রাগ হয়ে যায় আমার। তোর চৌত্রিশ বছর বয়স হতে চলল। কিন্তু এখনও বিয়ে দিতে পারলাম না। কেন বল তো? কারণ, ওই লোকটা! আমরা কোনওদিন বলেছিলাম কি যে, আমাদের এটা চাই ওটা চাই? বলিনি তো! তাও লোকটা কোম্পানির টাকা চুরি করতে গেল কেন? আমাকে সারা জীবন বাপের বাড়িতে শুনে যেতে হল, চোরের বউ! এটা কতটা কষ্ট আর অপমানের, ভাব একবার!"

"মা," টুপু মাথা নাড়ল, "বাবাকে যদি তুমি ভুলতে না-দাও যে, কী হয়েছিল, তা হলে লোকটা সারা জীবন এমন কুঁকড়ে থাকবে। কে না ভুল করে! বাবাও করেছে। শাস্তি পেয়েছে। এখন আর এসব বোলো না। বাবাকে গিয়ে বলো যে, আমি আজ ফ্ল্যাট দেখতে যাব। কেমন? দেখবে বাবা খুশি হবে।"

মা মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "মানব কি বাড়ির ভেতরে আসবে নাকি বাইরে থেকেই চলে যাবে? আচ্ছা, ও নাকি কীসব নতুন ব্যবসা করবে, তাই?"

"হ্যাঁ। একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্যাফে ব্র্যান্ড আছে। ওদের একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নেবে বলছে। মনোহরপুকুরে একটা ভাল আর বড় স্পেস দেখেছে। কিন্তু তাতে কী যেন একটা ঝামেলা আছে," টুপু বাথরুমের দিকে গেল, "আমি ফ্রেশ হয়ে স্নান করে নিই। আর আমি টোস্ট খাব, চিজ দিয়ে। দু'পিস। সঙ্গে ফ্রুট জুস। কেমন?"

মা টুপুর পেছন পেছন বাথরুম অবধি এল। জিজ্ঞেস করল, "শোন না, মানবের বাবা-মা কবে আসবে রে?"

টুপু ভুরু কুঁচকে ঘুরে তাকাল, "কেন? তারা আসবে কেন?"

"আরে, তোদের বিয়ের ব্যাপার! এখনও বিয়ে না করলে কবে করবি? এর পর তো ছেলেপিলে হতে হবে। বয়স হয়ে গেলে কমপ্লিকেশন এসে যায়।"

"মা প্লিজ়!" টুপু বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মা বাইরে থেকে সামান্য গলা তুলে বলল, "প্লিজ় বলে দরজা বন্ধ করে দিলেই তো আর সব সলভ হয়ে যাবে না। মানবকেই বিয়ে করবি তো, নাকি অন্য কেউ আছে?"

টুপু বাথরুমে দাঁড়িয়ে আয়নায় দেখল নিজেকে। তারপর কেউ যাতে শুনতে না পায়, তেমন ফিসফিস গলায় বলল, "অন্য কেউ আছে।"

কেন যে ওর ভাল লাগত সাজুকে কে জানে! কিন্তু লাগত। অমন শান্ত, ভদ্র আর নিচুস্বরে কথা বলা একটা ছেলে। ছোট ছোট করে ইয়ার্কি মারা একটা ছেলে। আর কোথায় যেন একা একটা ছেলে। নিজের কষ্টকে কোনওদিন কারও সামনে আনত না সাজু। সেই যে লাবুদি আচমকা ওকে ডাম্প করে দিল। সেটাতেও কিন্তু কোনও ঝামেলা ঝঞ্ঝাট করেনি। চুপ করে চলে গিয়েছিল এখান থেকে।

কী যে মনখারাপ হত তখন টুপুর! মনে হত, দৌড়ে চলে যায় সাজুর কাছে। জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমি তো আছি। তোমায় আমি এত ভালবাসব যে, কোনওদিন আর কোনও কষ্টের কথা, না-পাওয়ার কথা মনে আসবে না তোমার...' কিন্তু বলতে পারেনি কোনওদিন। লোকটা যে চলেই গিয়েছিল!

সাজুকে এতদিন পরে দেখে কী যে অদ্ভুত লাগছে! চুলে পাক ধরেছে সামান্য। চোখে চশমা। আর চশমার আড়ালে চোখ দুটো যেন ক্লান্ত, স্থির! যেন একটা অনিচ্ছুক জীবন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কে জানে, এখনও লাবুদিকে মনে মনে ভালবাসে কি না! সেদিন তো বলল, বাসে না। শুনে এত ভাল লেগেছিল! সেটা কি সত্যি? কিন্তু সেদিন বিনি এসে এমন করে ডেকে নিয়ে গেল কেন কে জানে! কাল দেখা হয়েছিল সাজুর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করেছিল টুপু। কিন্তু সাজু কিছু বলেনি। শুধু মাথা নেড়ে চলে গিয়েছিল। আশ্চর্য লোক! একটা কথা যদি সোজা করে বলে!

আর কিছুদিন পরে নাকি চলেও যাবে সাজু। সত্যি চলে যাবে? ভাবলেই কেমন একটা লাগছে। খালি মনে হচ্ছে, এই যে সাজু এল কলকাতায়, এটা ওর একটা সুযোগ। নিজের কথা বলার একটা সুযোগ। কিন্তু লোকটা কি শুনবে?

তা ছাড়া মানব? মানবের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে জেনে মোহিতস্যার যে খুব খুশি। মানবের সঙ্গে ব্রেক-আপ করে নিলে মোহিতস্যার কীভাবে নেবেন সেটা! তাতে চাকরির ওপর কি প্রভাব পড়বে? জীবনের সব কিছুই যেন চেন রি-অ্যাকশানে যুক্ত।

ওফ, জীবন যে কী জটিল! কেন এমন জটিল! মানুষের যা করতে ইচ্ছে করে সেসব কেন করতে পারে না! একটাই তো জীবন পায় সে! তাও সেখানে হাজার বাধা-নিষেধ। লক্ষ লোকের চোখরাঙানি। জাজমেন্টাল জেঠু থেকে শুরু করে ভুল-ধরা কাকিমা। নিজেরা কেউ নিজেদের ইচ্ছেমতো বাঁচতে পারেনি বলে যেন

অন্যকেও বাঁচতে দেবে না। সারাক্ষণ অন্যের জীবনে কাঠি করে যাবে। এ যেন র‍্যাগিংয়ের কনসেপ্ট। আমি র‍্যাগড হয়েছি বলে আমিও জুনিয়রদের র‍্যাগিং করব। শালা!

ঝরনার নীচে দাঁড়িয়ে শাওয়ার জেল মাখতে মাখতে শালাসহ আরও নানান গালাগালি দিল টুপু। গালাগালির মধ্যে বেশ একটা পারগেটিভ ব্যাপার আছে। ভাল করে দিতে পারলে মনের ময়লা আর অসন্তোষ দূর হয়ে যায়।

স্নান সেরে খেয়েদেয়ে বাবার কাছে এল টুপু। বাবা বিছানার ওপর বসে খবরের কাগজ খুলে পড়ছে।

"বাবা," টুপু ডাকল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ!" বাবা যেন জলের তলা থেকে মুখ তুলে তাকাল।

বাবার চোখ দুটো সামান্য এলোমেলো। মুখেও একটা কী যেন ভুলে গিয়েছি ধরনের হাসি।

"আমি আজ ফ্ল্যাট দেখতে যাচ্ছি। টালিগঞ্জের কাছে। পছন্দ হলে বুক করব।"

বাবা হাসল। তারপর মাথা নাড়ল। কেমন বাচ্চাদের মতো হাসি।

টুপু বলল, "তোমার জন্য কিছু আনব? হজমি আছে?"

"হজমি?" বাবা তাকাল ওর দিকে, "না রে। ফুরিয়ে গিয়েছে। ওই মানে, একটা হয় না আনারদানা? আনবি? অনেক দাম?"

"আনব, তুমি দাম নিয়ে ভেবো না। বিকেলের মধ্যে চলে আসব। আমি আসি, কেমন?" টুপু হাসল।

বাবাও খুব খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। তারপর হাত বাড়াল। টুপু সামান্য ঝুঁকল বাবার দিকে। বাবা হাত বাড়িয়ে ওর থুতনিটা ধরে নিজের হাতটা ঠোঁটে ছোঁয়াল। বলল, 'টুপুমা, সাবধানে যাস।"

মাকে বলে বাইরে বেরল টুপু। গেটের কাছে মানব এসে গিয়েছে। গাড়িতে বসে মেসেজের পর মেসেজ করে তাড়া দিচ্ছে। ফ্ল্যাট দেখে পার্ক স্ট্রিট যাবে। সেখানেই লাঞ্চ করার কথা।

মা বলেছিল মানবকে ঘরে ডাকতে। কিন্তু টুপু ডাকেনি।

বাগানে আজ কী রোদ! তবে হাওয়াও আছে। পুকুরের ওইদিকে আবার নতুন করে বাসা বাঁধছে বাবুই। গতকাল ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। ওর বাসাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

গেটের কাছে মানবের বড় গাড়িটা দেখতে পেল টুপু। বাপের পয়সায় গাড়ি চড়ছে!

মানব আগে চাকরি করত। এখন ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, চাকরি করতে নাকি ইচ্ছে করে না। ব্যবসা করবে। হ্যাঁ, ব্যবসা করেছিল। একটা থিম রেস্তরাঁ। কিন্তু চলেনি। বাপের একগাদা টাকা নষ্ট হয়েছে মাত্র। এখন চাইছে ক্যাফে। দেখা যাক কী করে!

মানবকে যেন আর সহ্য করতে পারছে না ও। কী যে করবে! এই যে ও মানবের গাড়িতে করে যাবে, এটা যেন সাজু দেখতে না পায় ভগবান!

"এই টুপু শোন।"

গেটের কাছে গিয়েই ডাকটা শুনল টুপু। লাবুদির গলা। ও পেছন ঘুরল। দেখল, রাস্তার একপাশে সাজুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাবুদি। আর লাবুদি সাজুর গালে হাত দিয়ে কী একটা কুটো সরাচ্ছে।

দৃশ্যটা দেখামাত্র শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা ঝটকা লাগল ওর। বুকের মধ্যে কীসের যে একটা তীক্ষ্ণ কষ্ট ঝিলিক দিয়ে উঠল! টুপু দেখল, বেশ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জনে।

লাবুদি বলল, “শোন না। প্লিজ, রেমির জন্য একটা র‍্যাকেট কিনে আনবি? কাল একটা ভেঙে ফেলেছে। কিনে আনিস আমি টাকা দিয়ে দেব।”

টুপুর মাথাটা দুম করে গরম হয়ে গেল। এখানে দাঁড়িয়ে লাবুদির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলা হচ্ছে! আর সেদিন বলে কিনা প্রেম নেই!

টুপু কষ্ট করে হাসল। তারপর বলল, ‘টাইম হবে না গো লাবুদি। আমার বয়ফ্রেন্ড মানবের সঙ্গে ফ্ল্যাট দেখতে যাচ্ছি। ওই সাজুদাকে বলো না। ও তো সারা জীবন তোমার কাজ করে দিয়েছে। তাই না? এখনও করে দেবে। বাই।”

লাবুদি কী বলবে বুঝতে না পেরে থতমত খেয়ে গেল।

টুপু আর তাকাল না। সোজা গাড়ির সামনের দরজা খুলে উঠে পড়ল। তারপর সিট বেল্ট বেঁধে মানবের দিকে তাকিয়ে বলল, “চলো।”

মানব তৈরিই ছিল। এবার গাড়ি স্টার্ট করে এগিয়ে গেল লাবুদিদের ছাড়িয়ে।

টুপুর মাথায় যেন আগুন জ্বলছে! মনে হচ্ছে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে আরও কিছু কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে সাজুকে। মিথ্যুক একটা!

ও গাড়ির সাইডের রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখল। দেখল, লাবুদি হাত নেড়ে কিছু কথা বলছে সাজুকে। কিন্তু সাজু যেন সেসব শুনছে না। ও শুধু তাকিয়ে আছে দূর থেকে আরও দূরে চলে যাওয়া টুপুদের এই গাড়িটার দিকে।

আবার বাবুই

গতকাল আমার বাসাটা ভেঙে গিয়েছে। এমনিতে সব ঠিকই ছিল মোটামুটি। বেশ কষ্ট করেই বানিয়েছিলাম খানিকটা, কিন্তু আচমকা এমন ঝড়বৃষ্টি হল যে কী বলব!

আমার কপালটাই খারাপ। যাই করতে যাই না কেন ভেস্তে যায়। ওদিকে প্রদ্যুম্নদের বাসাও যে তৈরি হচ্ছে! আর ওদের সঙ্গেই তো সারাক্ষণ বকবক করে কুমুদিনী।

আজ এই শেষ বিকেলে ওই ভেঙে পড়া বাসার সামনে আমি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন সতুদা ফুড়ুক করে উড়ে এসে বসেছিল পাশে। তারপর ভাঙা বাসার চেয়েও আমার ভাঙাচোরা মুখ দেখে কাঁধে নিজের পাখনা রেখে বলেছিল, "আবার ক্যালানের মতো মুখ করে আছিস! তোকে বলেছি না হাল ছাড়বি না! দেখ, ওরা কুমুদিনীকে ইমপ্রেস করতে গিয়ে টাইম ওয়েস্ট করছে। নিজেদের বাসার দিকে মন দিচ্ছে না। তুই কাজে লাগা এই সময়টা। জানবি বাবুই, সময়ের চেয়ে মূল্যবান কিছু নয়। এর চেয়ে অমোঘ কিছু নেই। একে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে এ তোর বন্ধু, আর না-পারলে এর চেয়ে বড় শত্রু কেউ নেই।"

আমি তাকিয়েছিলাম সতুদার দিকে। বলেছিলাম, "এত কষ্ট করে বানালাম, দ্যাখো ভেঙে গেল!"

"তো?" সতুদা তাকিয়েছিল আমার দিকে, "তুই আমার কাছ থেকে সিমপ্যাথি চাইছিস? শোন, সিমপ্যাথি আশা করলে ভুলে যা। ওই পুকুরের পাড়ে যে সুন্দরমতো মেয়েটা মাঝে মাঝে বসে থাকে, কার না কার ওপর অভিমান করে, ওর পাশে গিয়ে বসে পড়। তারপর দু'জনে মিলে ওসব সেন্টু সেন্টু খেলা করিস!"

"তুমি রাগ করছ সতুদা?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সতুদা হেসেছিস সামান্য। তারপর বলেছিল, "শোন বাবুই, ওরা যখন কুমুদিনীকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছে, তখন তুই মন দিয়ে নিজের কাজটা কর। জানবি সৎ থাকলে, একাগ্র থাকলে সাফল্য আসেই। হয়তো দেরি হয়, তবু আসেই। অধ্যবসায়ের বিকল্প কোনওদিন কিছু ছিল না, কোনওদিন কিছু হবে না। তুই চেষ্টা কর আবার। হবে।"

আমি তাই চেষ্টা করছি। আবার নতুন করে বানানোর চেষ্টা করছি আমার বাসা। ছুটকো, প্রদ্যুম্ন, বন্ডেল, সুহার্তোদের সঙ্গে কুমুদিনী কথা বললেও, আমার দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু আমি ওইদিকে আর মন দেব না। সতুদা ঠিক বলেছে, কাজটাই আসল।

আমায় এখন যেতে হবে রেললাইনের ধারে। আবার লম্বা লম্বা ঘাস নিয়ে আসতে হবে। আগের বারের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, কীভাবে ভাল করে গিঁট দিতে হবে। আর আমি আমার বাসাকে ভাঙতে দেব না।

আমি রেললাইনের দিকে উড়তে যাব, কিন্তু তখনই থমকে গেলাম। আরে, সেই লোকটা আসছে এদিকে। ওর আবার কী হল! আর ওর হাতে ওসব কী! ঘাস। লম্বা, সরু ঘাস। লোকটা কি আমার জন্য ঘাস নিয়ে আসছে! এই লোকটাকেই তো তাকিয়ে দেখে ওই ঠোঁটের ওপর তিলওলা মেয়েটা।

লোকটা ঘাসের বান্ডিলটা রাখল গাছ থেকে একটু দূরে। তারপর একবার দেখল আমায়। আমি গাছের ডালের ওপর বসে ফুড়ুক ফুড়ুক করে লেজটা নাড়ালাম। যদি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারতাম, তা হলে

থ্যাঙ্ক ইউ বলতাম।

লোকটা আমায় দেখে হাসল নিজের মনে, তারপর চলে গেল বড়-গেটের দিকে। আমি গাছের ডাল থেকে উড়লাম ঘাস নেব বলে আর তখনই দেখলাম ওই রাগী মেয়েটাকে। নিজের ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে গেটের দিকে।

জানেন, কুমুদিনী আর ওই মেয়েটার চোখের দৃষ্টি হুবহু একরকম! সত্যি বলছি, মাঝে মাঝে পাখিদের সঙ্গে মানুষের এমন মিল পাওয়া যায় যে, ভাবলে অবাক লাগে!

আচ্ছা আপনাদের কী মনে হয়, আমি বাসাটা বানাতে পারব? আর ওই রাগী মেয়েটার রাগও কি কমবে কোনওদিন?

এগারো

বিছানার একপাশে ওর জাঙ্গিয়াটা পড়ে আছে। দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু উঠে নিতে ইচ্ছে করছে না রতিশের। ও হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশের টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল।

ঘরটায় আলো কম। হাওয়ায় অদ্ভুত সুন্দর বেলফুলের গন্ধ ভেসে আছে।

রতিশ আজই প্রথম এল এখানে। মধ্য কলকাতার অফিসপাড়ার ভেতরে এই জায়গাটার খবর ওকে দিয়েছিল বুচা।

সাধারণত কোনও মেয়েকে পছন্দ হলে তাকে নিয়ে রতিশ লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে যায়। সেখানেই তার সঙ্গে সময় কাটায়, তারপর টাকাপয়সা মিটিয়ে ছেড়ে দেয়।

কলকাতায় এখন ব্যাঙের ছাতার মতো এসকর্ট সার্ভিস গজিয়ে উঠেছে। এমনকী, মোবাইলেও মেসেজ আসে। পুরুষ নারী সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আহ্বান আসে। কিন্তু এসব চক্করে পড়ে না রতিশ। ওর বুচা আছে।

বুচা ছেলেটা ওর হয়ে কাজ করে। আর পাশাপাশি এসবও করে।

রতিশ ওকে জিজ্ঞেস করে, "এসব দালালি করতে ভাল লাগে তোর?"

বুচা হাসে। তারপর নিচু গলায় বলে, "দ্যাখো, এসব তো ব্যবসা। আদিমতম ব্যবসা। তাই না? আর যেটা থেকে টাকা আসে সেটাতেই আমি আছি। যেসব ছেলে বা মেয়েরা এইসব লাইনে আছে, তাদের আমায় দরকার আর আমারও ওদের থেকে টেন পারসেন্ট কমিশন দরকার। হিসেব তো সোজা!"

বুচার সঙ্গে সব সময় একটা ব্যাগ থাকে। তাতে থাকে ছোট ছোট তিন-চারটে অ্যালবাম। ছেলে আর মেয়েদের ছবির অ্যালবাম আর কী! ক্লায়েন্টের কাছে ও সেই অ্যালবাম খুলে দেখায়।

রতিশ বলে, "এখন তো মোবাইলের যুগ। ছবির সফট কপি রাখিস না কেন? এসব ভারী ব্যাগ বইতে হয় না তা হলে।"

বুচা বলে, "ধুর, সফট কপিতে সেই মজাটাই নেই। মনে নেই রতুদা, সেই আগেকার দিনে যে ছোট ছোট হলুদ বই পাওয়া যেত! সেই স্কুল লাইফে সবাই লুকিয়ে পড়ত। অমন কিক আর পেয়েছ কোনওদিন? যতই গুরু মোবাইলের স্ক্রিনে ছবি দ্যাখো, হার্ড কপি হাতে ধরে ছবি দেখার মজাই আলাদা, তাই না?"

তা, বুচা ওকে অ্যালবাম দেখায়। আর পছন্দমতো মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে রতিশ।

এই মেয়েটার ছবিও বুচা দেখিয়েছিল আর বলেছিল, "রতুদা, এ কিন্তু ফ্ল্যাটে আসবে না। তোমার বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে হলে তোমায় নিজেকেই যেতে হবে ওর কাছে। আমি সেটিং করে দেব। তবে খরচ আছে। ঘণ্টায় সাড়ে আট হাজার টাকা আর একবার বন্ধুত্ব। তারপর ওই এক ঘণ্টার ভেতরে বন্ধুত্ব করার সংখ্যা বাড়লে পার বন্ধুত্ব পাঁচ হাজার। হোল নাইট হলে পঁচাত্তর। আর সারা দিন-রাত হলে দেড় লাখ। এখন দ্যাখো কী করবে। দেড় লাখ বুক করে দিই?"

"মারব শালা! টাকার গাছ দেখেছ আমার?" রতিশ আলতো করে চড় মেরেছিল বুচার মাথায়। বলেছিল, "সারা দিন-রাত কী করব ওর সঙ্গে? দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব, নাকি উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা দেখব?"

"আরে, আমি গরিব মানুষ। আমার কমিশনের কথাটা একটু ভাববে না? তুমি একাই গুরু বিলিতি বাইক চড়বে? আমি কি শালা একটা দেশি বাইকও চালাতে পারব না?" বুচা দুঃখী মুখ করে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

"মারব শালা। তুই এক ঘণ্টার বুকিং কর।"

পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়েছে। এর মধ্যে একবার বন্ধুত্ব করেছে রতিশ। আর-একবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পাঁচ হাজারের কথা ভেবে এগোয়নি।

সিগারেট ধরিয়ে সিলিংয়ের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রতিশ ভাবল, কী দিনকাল এসে পড়েছে! বন্ধুত্ব বলে কীসব হচ্ছে! ওদের স্কুল লাইফে বন্ধু আর বন্ধুত্বর সংজ্ঞাই অন্যরকম ছিল। আজকাল তো সব কিছুরই কেমন যেন দু'-তিনরকম মানে হয়ে গিয়েছে। কাউকে কিছু বললে সে যে কী ধরবে কেউ জানে না।

দরজাটা আবার খুলে গেল। কাঠের স্লাইডিং ডোর। খুললে কেমন যেন একটা হুশ ধরনের শব্দ হয়। রতিশের মনে হল, হুশহুশ করে কি ওকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে?

মেয়েটার নাম সিলভি। আসল নাম যে নয় সেটা বুঝতেই পারছে। আর আসল নাম জেনে ও করবেই-বা কী! আধার কার্ড তো বানাতে আসেনি এখানে।

সিলভি একটা সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে আছে। গাউনের ওপরের খোলা অংশ দিয়ে ক্লিভেজের সঙ্গে একটা সরু সোনার হারও দেখা যাচ্ছে।

সিলভি কাছে এসে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, "তুমি আর-একটা শট চাও?"

যেন ফুটবল খেলতে এসেছে! রতিশ মনে মনে হাসল। তারপর মাথা নাড়ল। বলল, "না না। আর তো সময় নেই। আমি উঠব এবার।"

"আরে, ঠিক আছে!" সিলভি হাসল, "এক ঘণ্টা মানে পাক্কা যে এক ঘণ্টাই, তা কিন্তু নয়। এখানে মানুষ আসে রিল্যাক্সড হতে। তাকে অত কঠিনভাবে সময় মেনটেন করতে হলে তো সে কিছুই করতে পারবে না, তাই না?"

সিগারেটটা শেষ করে পাশের অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে রতিশ বলল, "আমায় উঠতে হবে আসলে।"

সিলভি ঠোঁট কামড়ে তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, "আবার এসো তা হলে। আমার ভাল লাগল তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে," বলে নিজেই খাটের এক কোনায় পড়ে থাকা জাঙ্গিয়াটা এগিয়ে দিল ওকে।

জামাকাপড় পরে উঠে দাঁড়াল রতিশ।

সিলভি বলল, "দাঁড়াও। চা করেছি। খেয়ে যাও। আমার পরের দু'ঘণ্টা কোনও বুকিং নেই। বুচা বলছিল যে, তুমি পলিটিক্সে আছ। তাই?"

ঘরের একদিকে তিনটে ছোট সোফা আর একটা কাঠের টেবিল দিয়ে বসার জায়গা করা আছে। রতিশ বসল সেখানে গিয়ে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা অল্পবয়সি ছেলে এসে ওর সামনে এক কাপ চা আর কয়েকটা কাজুবাদাম রেখে গেল।

সিলভি এসে বসল ওর পাশে। বলল, "আমার একটা হেল্প করবে?"

"হেল্প!" সামান্য অবাক হল রতিশ। না, মেয়েটা সাহায্য চাইছে বলে নয়, সে তো ওর কাছে অনেকেই চায়, ও অবাক হল এই কারণে যে, এই পেশায় যুক্ত মেয়েরা সহজে তো পারসোনাল কিছু ব্যাপার ক্লায়েন্টদের সঙ্গে আলোচনা করে না।

সিলভি বলল, "আমার এক জেঠিমা আছে। মানে দূর সম্পর্কের। কেউ নেই আর কী। শরীরও ভাল নয়। আমি একটা ওল্ড এজ হোমে রেখেছি। ওরাই চিকিৎসা করায়। আমায় মাসে মাসে টাকা দিতে হয়। খাওয়া-থাকার জন্য আঠারো হাজার আর সঙ্গে চিকিৎসার খরচটা বাড়তি। সব মিলিয়ে প্রায় তেইশ চব্বিশ হাজার বেরিয়ে যায় মাসে। কিন্তু মাসখানেক ধরে ওরা খুব অসভ্যতা করছে। ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে না। তুমি যদি অন্য কোনও জায়গায় ব্যবস্থা করে দাও! টাকাটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে। সেটাও যদি মাথায় রাখো একটু।"

রতিশ অবাক হল। আরে বাবা, এ যে মেঘ না-চাইতেই জল! বিনির সঙ্গে যোগাযোগ করার একটা অন্তত উপায় পাওয়া গেল। সত্যি কোনও জিনিস মন দিয়ে চাইলে ভগবান সাহায্য করেনই।

রতিশকে চুপ করে থাকতে দেখে সিলভি বলল, "তুমি বোধ হয় বিরক্ত হলে। আসলে এখন সব কিছুই তো সোর্স দিয়ে গেলে সুবিধে হয়। তাই বললাম।"

"না না, বিরক্ত নই," রতিশ হাসল। তারপর বলল, "আমি দেখে নেব। তারপর বুচাকে জানিয়ে দেব। কেমন?"

সিলভি বলল, "আমি তোমাকে আমার পারসোনাল নাম্বার মেসেজ করে দিচ্ছি। সেখানে আমাকেই বোলো। বুচাকে এর মধ্যে আনার দরকার নেই। আর আমার নাম রমলা।"

রতিশ উঠল। তারপর মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে সামনের টেবলে রেখে বলল, "ঠিক আছে। আমি খবর দেব।"

বাড়িটা বড়। পুরনো। আদ্যিকালের লিফট বসানো আছে। পাশ দিয়ে কাঠের সিঁড়ি। তাতে আবার একটা জুটের কার্পেট পেরেক দিয়ে গেঁথে পাতা রয়েছে। এসব বাড়িতে রোদ্দুর ঢোকে না। শুধু দূরের কয়েকটা স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসে। তাতে এই আলো-আঁধারি যেন আরও রহস্যময় লাগে। আর বাইরে প্রচণ্ড গরম হলেও, এখানে কেমন যেন স্যাঁতস্যাঁত করছে চারদিক। কয়েক দশকের শীতলতা যেন আটকে রয়েছে হাওয়ায়।

ও বাড়িটার চারতলায় আছে এখন। কিন্তু লিফটের জন্য আর অপেক্ষা করল না। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে লাগল। আর ওই অবস্থাতেই ফোন বের করে ডায়াল করল বুচাকে।

চারবার রিং হওয়ার পরে ফোনটা ধরল বুচা।

"কোথায় থাকিস? এতবার রিং হয় কেন?" রতিশ বিরক্ত হল।

বুচা থমকাল একটু, তারপর বলল, "এই মানে কলেজের কাছে আছি। যেমন তুমি বলেছিলে! এত খিট খেয়ে আছো কেন রতুদা? বন্ধুত্ব ঠিকমতো হয়নি?"

"শালা, তোর পেছনে ভরে দেব বন্ধুত্ব! যা বলছি সেটা শোন," রতিশ বিরক্ত হল, "দেখবি, বিনি যেন কলেজ থেকে বেরিয়ে ওই লক্কা পায়রাটার সঙ্গে কোথাও না-যায়। আমি আসছি কলেজে। খুব দরকার। আর

যদি বেরোয়, তা হলে ওকে ফলো করবি। আর আমায় জানাবি কোথায় যাচ্ছে, বুঝলি?”

বুচা বলল, “সে করছি। কিন্তু রতুদা, মাইরি, একটু বেশি অবসেসড হয়ে পড়ছ না তুমি?”

“কানের গোড়ায় দেব তোকে। আমি অবসেসড হচ্ছি কি না সেটা তোকে দেখতে হবে না। যা বলছি কর,” ফোনটা রেখে রাস্তায় পা রাখল রতিশ।

বাড়িটার উলটো দিকে একটা পানের দোকান। তার সামনে ও নিজের মোটরবাইকটা পার্ক করে রেখেছে। দামি বাইক। পানওয়ালাকে বলেছিল একটু নজর রাখতে।

স্ট্যান্ড থেকে বাইকটাকে নামাল রতিশ। বিশাল ভারী। একবার মাটিতে কাত হয়ে পড়ে গেলে পাঁচ-ছ'জন লাগবে তুলতে। কাউকে ধাক্কা মারলে সে আঃ বলার সময় পাবে না।

বাইকে বসে স্টার্ট করল রতিশ। এই রমলা বলে মেয়েটা ওকে একটা সুযোগ করে দিয়েছে। এটা ও হারাতে চায় না।

কেউ কেউ আছে যাদের দেখে মনে হয়, জীবনের এই দিন অবধি এই মানুষটা কোথায় ছিল! কেন এর সঙ্গে আগে দেখা হল না আমার! আরে, এইরকম ফিলিং যখন আসে, তখন বয়স-টয়সের কথা মাথাতেও আসে না। শুধু জেদি, একবগগা একটা ইচ্ছে এসে চেপে ধরে মনটাকে।

এর আগে স্বপ্নার বেলাতেও এমন হয়েছিল রতিশের। কিন্তু সেই ব্যাপারটা ভেঙে যাওয়ার পরে ও এত কষ্ট পেয়েছিল যে, ভেবেছিল আর এমন কিছুতে ও জড়াবে না নিজেকে। কিন্তু জীবনে মানুষ যা ঠিক করে, জীবন ঠিক তার উলটোটা এনে হাজির করে তার সামনে।

এই তো সেদিন আর থাকতে না-পেরে বিনির বাড়িতেই চলে গিয়েছিল রতিশ। তবে এবারে আর সেই আগের মতো মারমুখী হয়ে যায়নি। বরং সামান্য হেসে বিনীতভাবেই গিয়েছিল।

দরজা খুলেছিল রুনু। রতিশকে চিনতে পেরে সামান্য ভয়ও যেন পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি। বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। তারপর পরদার ওদিকে দাঁড়িয়ে বিনিকে ডেকে বলেছিল সাজু মানে সরযুকে ডেকে আনতে।

বিনির গলার স্বর শুনেছিল রতিশ। দেখতে পায়নি। ওর খুব ইচ্ছে করছিল একবার পরদা সরিয়ে দেখে। কিন্তু নিজের ইচ্ছেটাকে সামলেছিল ও। এর পর রুনু এসে বসেছিল সামনে। আগে রুনুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল রতিশ। আর সেটার জন্যই হয়তো রুনু আড়ষ্ট হয়ে কাঠের পুতুলের মতো বসেছিল।

রতিশ কথা শুরু করেছিল হালকাভাবে। বলেছিল, অতীতে যা হয়েছে সেসব যেন ভুলে যায় রুনু। তারপর এটা-ওটা বলার মাঝে জেনে নিয়েছিল বিনির ব্যাপারে। জেনেছিল কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে। অবশ্য এটা ও জানত। কিন্তু এটা জানত না যে, মেয়েটা একটা ওল্ড এজ হোমের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে ও বয়স্ক মানুষজনের সঙ্গে সময় কাটায়, তাদের দায়ে দফায় সাহায্য করে। ভাল লাগছিল রতিশের। মনে হচ্ছিল, যে-মেয়েটাকে ওর পছন্দ, মানুষ হিসেবেও সে ভাল। নিজের মনে কেমন একটা অপরাধবোধও হচ্ছিল। বিনির পাশে নিজেকে রেখে ওর মনে হচ্ছিল পার্টি করে বলে সবাই সামনে সমীহ করলেও, আসলে মানুষ ওকে ভয় পায়। কারণ, মনে মনে তারা জানে, রতিশ একটা গুন্ডা। রতিশের আচমকা মনে হচ্ছিল, ওর কি আরও ভাল ও ভদ্র হওয়ার মতো সময় এখনও আছে!

সাজু এসেছিল একটু পরেই। এই সেই লোক যাকে ঘরের দরজা থেকেই ফিরিয়ে দিয়েছিল ও।

নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করছিল রতিশের। কীসব করেছে বোকার মতো! জিতেশদা ঠিকই বলেন, রাগ দেখিয়ে জীবনে কিছু হয় না।

সাজু ছোট্ট কথায় জিজ্ঞেস করেছিল রতিশ কী চায়।

রতিশ বলেছিল, "দেখুন, আমি যা করেছি সেসব ভুলে যান। ফ্ল্যাটটা আমার দরকার। আমি মাসে মাসে ভাড়া দিতে রাজি আছি। ভাল লোকেশনে ফ্ল্যাট। আমি দশ হাজার টাকা করে ভাড়া দেব। কিন্তু ছাড়তে বলবেন না।"

রুনু কিছু বলতে গিয়েছিল। কিন্তু সাজু হাত তুলে নিজের দিদিকে থামিয়ে বলেছিল, "থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর অফার। কিন্তু আমাদের ওটা খালি চাই। প্লিজ় বুঝুন। আমাদের নিজেদের জিনিস যদি নিজেরাই না ব্যবহার করতে পারি, তা হলে কী লাভ! তাই না?"

তারপরেও ভাল কথায় বোঝাতে চেয়েছিল রতিশ। কিন্তু ওরা মানেনি কিছুতেই। মাথা খুব গরম হয়ে গিয়েছিল ওর। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছিল রতিশ। ও চায়নি বিনির সামনে কিছু করে ফেলে।

ফেরার পথে একবার ভেবেছিল যে, ছেড়েই দেয় ফ্ল্যাটটা। বিনি অন্তত ভাল ভাববে ওকে। কিন্তু তারপরেই নিজেকে বলেছিল, এতটা মাথাখারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি! যে-মেয়েটা সম্বন্ধে ভাল করে কিছু জানল না, তার জন্য এত বড় স্যাক্রিফাইস করবে কেন! তা ছাড়া ছেড়ে দেওয়া মানে নিজের আধিপত্যের সঙ্গে একটা কম্প্রোমাইজ় করা। সেটা ও করতে চায় না কিছুতেই। আর ফালতু সেন্টিমেন্ট দেখিয়ে এসব কাজ করতেও নেই।

রতিশ ভেবেছিল পরে সুযোগমতো ও বিনির সঙ্গে কথা বলবে।

সেই কথা বলার দিনটা আজ।

রমলা যেই বলেছিল ওর দূর সম্পর্কের জেঠিমার কথা, সঙ্গে সঙ্গে রতিশের মাথায় খেলে গিয়েছিল এই আইডিয়া। ও ইচ্ছে করলে নানান সংস্থায় কথা বলে একটা ব্যবস্থা করে দিতেই পারে, কিন্তু তা হলে তো বিনির সঙ্গে কথা বলা যাবে না। ওই বৃদ্ধাকে বিনিদের ওই বৃদ্ধাশ্রমে রাখা গেলে দারুণ হবে। বিনির সঙ্গে একটা কথা বলার সূত্র পাওয়া যাবে আর তার পাশাপাশি এটাও ও বিনিকে বোঝাতে পারবে যে, রতিশ গুন্ডা নয়। ওর মধ্যেও একটা ভাল লোক আছে যে, মানুষজনকে সাহায্য করে।

কলেজের সামনে গিয়ে বাইক নিয়ে দাঁড়াতেই বুচা দৌড়ে এল। বলল, "রতুদা ঠিক সময়ে এসেছ! ওরা ওই দোকানটায় গিয়েছে খেতে। তুমি যাও। কথা বলো।"

ওই দোকান মানে সামান্য দূরে একটা মোমোর দোকান। বাইকটা দোকানের এক পাশে রাখল রতিশ। তারপর সামান্য হাসি হাসি মুখ নিয়ে এগিয়ে গেল দোকানটার দিকে।

দোকানে পাঁচ-ছ'টা ছেলেমেয়ের সঙ্গে বিনিও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রতিশ দেখল, সেদিনের ওই ছেলেটাও আছে পাশে। আর বিনির ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলছে আর হাসছে। ছেলেটার নাম চিত্ত। বুচা খবর এনে দিয়েছে আগেই।

দেখেই মাথাটা আবার গরম হয়ে গেল। কী সাহস! এত কাছে গিয়ে গায়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে কথা বলার কী আছে! একটা সভ্যতা-ভব্যতা নেই! নিজেকে সামলাল রতিশ।

ও দোকানে ঢুকে ডাকল, "বিনি, বিনি! একটু শুনবে।"

ডাক শুনে পেছনে ঘুরেই রতিশকে দেখে বিনি কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। মুখটা সাদা হয়ে গেল নিমেষে।

রতিশ হেসে বিনির সামনে এগিয়ে গেল, "আরে, আমি তোমাকে বলছি। আমার না একটা দরকার আছে তোমার সঙ্গে।"

"কী দরকার আমায় বলুন!" পাশ থেকে চিত্ত এগিয়ে এল।

গলার স্বর আর ভঙ্গিটা ভাল লাগল না রতিশের। ও চোয়াল শক্ত করে রাগটাকে গেলার চেষ্টা করল। কিন্তু রাগ শুকনো ভাতের দলার মতো। ইচ্ছে করলেই গিলে ফেলা যায় না।

রতিশ বলল, "তুমি কে ভাই? আমি বিনির সঙ্গে কথা বলতে চাই। তুমি ফোটো।"

"ফোটো মানে?" চিত্ত রাগের গলায় বলল, "ইয়ার্কি পেয়েছেন? এর আগেও আমি দেখেছি আপনি কলেজের সামনে এসে বিনির দিকে তাকিয়ে থাকেন। ওদের বাড়িতেও নাকি গিয়েছিলেন! নিজের বয়স দেখেছেন? আঙ্কেল আপনি, আঙ্কেল! ইয়ং মেয়েদের পেছনে জিভ বের করে ঘোরেন, লজ্জা লাগে না?"

রতিশের আচমকা কী যে হল সেটা ও নিজেও বুঝতে পারল না। হাত বাড়িয়ে পাশের কাউন্টারে রাখা স্টিলের জগটা তুলে নিয়ে সপাটে মারল চিত্তর মুখে।

আঁক শব্দ করে চিত্ত নাক চেপে বসে পড়ল মাটিতে। আশপাশের কয়েকটা ছেলে, যারা সামনে এসে ভুরু কুঁচকে সামান্য হিরো সাজার চেষ্টা করছিল, তারা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল।

চিত্তর নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ও মুখ তুলে তাকাল। রতিশ এবার সটান লাথি মারল চিত্তর পেটে। আর ছেলেটা প্রায় ছিটকে গিয়ে পড়ল পেছনের কোল্ড ড্রিঙ্ক রাখার কাচের দরজাওয়ালা ফ্রিজটার ওপর। ঝনঝন করে কেঁপে উঠল সব।

বিনির সঙ্গে অন্য দুটো মেয়েও চিৎকার করছে ভয়ে। বাকি ছেলেগুলো কী করবে যেন বুঝতে পারছে না।

রতিশ এবার হাতের জগটা ছুড়ে মারল চিত্তর গায়ে। তারপর বিনির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি সিম্পল একটা কথা বলতে এসেছিলাম। জাস্ট সিম্পল একটা কথা। দ্যাখো কী হল, দ্যাখো! ইডিয়ট! আমি রাক্ষস নাকি? আমি কী করেছি? কী করেছি?"

"রতুদা চলো, চলো বলছি," আচমকা বুচা এসে পেছন থেকে টানল রতিশকে। আর টানতে টানতে বের করে নিয়ে গেল দোকানের বাইরে। রাস্তায় লোক জমে গিয়েছে এরই মধ্যে। দোকানের কর্মচারী তিনজন ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছে একদম।

রতিশ রাস্তা থেকে চিৎকার করে বলল, "আমার ভাল লাগে তোমায়। তাই এসেছিলাম কথা বলতে... হেল্প চাইতে। সেখানে এই ছেলেটা... এটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না... এটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না বিনি, মনে থাকে যেন!"

বারো

আবার আসছে ফোনটা। কী যে বিরক্তিকর! বাদুদা কিছুতেই শুনতে চাইছে না। আরে বাবা, ও করতে চায় না ওরকম ছোট বাজেটের সো-কল্ড আর্ট ফিল্ম। ও এখানে এসেছে বাণিজ্যিক ছবির নায়িকা হবে বলে। এভাবে ছোট বাজেটের ফিল্ম করার জন্য নয়।

ইলা ধরল না ফোনটা। দেখল, দশটা মিস কল হয়ে আছে। লোকটার কাণ্ডজ্ঞান নেই! দেখছে ধরছে না, তাও বারবার ফোন করে যাচ্ছে।

মিতুল তো রাগ করছিল রীতিমতো। বলছিল, পরের দিন থেকে সবাই যেন ফোন জমা করে ঢোকে ওয়র্কশপে।

একটা ব্যাপারে অদ্ভুত লাগছে ইলার। আজকেও ওকে সেই সেকেন্ড নায়িকার রোলেই প্র্যাকটিস করতে হয়েছে। ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য ব্রেকের সময় ও গিয়েছিল মিতুলের কাছে।

মিতুল একটা চেয়ারে বসে কফি আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছিল। আর ওর ফার্স্ট এডিটরের সঙ্গে শুটিং ডেট নিয়ে কীসব যেন আলোচনা করছিল।

ইলা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সামনে। মিতুলের বয়স বছর চল্লিশ। ছোট করে কাটা চুল। কাঁচাপাকা। সারাক্ষণ সিগারেট খায়। ইলা শুনেছে, সাউথ ইন্ডিয়ান একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মিতুলের। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। এক ছেলে আছে দেহরাদুনের কোনও এক স্কুলে পড়ে। মিতুলের কাছে গেলেই ইলা একটা কড়া গন্ধ পায়। তবে সেটা তামাকের না ওর মেজাজের, সেটা বুঝতে পারে না।

আজও সেই গন্ধটা পেয়েছিল ইলা।

নিজের সহকারীর সঙ্গে আলোচনা থামিয়ে ইলার দিকে তাকিয়েছিল মিতুল। নীরবে জিজ্ঞেস করেছিল, কী চায় ও?

পাশ থেকে একটা ক্যাম্প চেয়ার টেনে নিয়ে ইলা বসেছিল। ওর নিজের হাতেও একটা কফির কাপ ছিল। সেটা এক চুমুকে শেষ করে চেয়ারের পায়ার কাছে রেখেছিল। তারপর বলেছিল, "বিজনস্যার কিছু বলেননি?"

মিতুল ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "কী ব্যাপারে?"

ইলা ইতস্তত করেছিল সামান্য। তারপর বলেছিল, "না, মানে আমার রোলের ব্যাপারে?"

মিতুল স্যান্ডউইচ শেষ করে হাতটা মুছেছিল একটা পেপার টাওয়েলে। তারপর সামনের টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে বের করেছিল একটা সিগারেট। টিংটং মিউজিকাল লাইটার জ্বালিয়ে সেটা ধরিয়ে, অনেকটা ধোঁয়া গিলে নিয়েছিল একবারে। তারপরে বলেছিল, "কী নিয়ে আমায় বলবেন বিজনদা?"

ইলা সামান্য থমকে গিয়েছিল। ভেবেছিল ওর কি বলা ঠিক হবে? তারপর সাহস করে বলেছিল, "মানে, আমার রোলটা নিয়ে আর কী!"

"তোমার রোল নিয়ে কী বলবেন বিজনদা? উনি প্রোডিউসার, ডিরেক্টর তো নন। ফিল্ম নিয়ে আমি কারও কথা শুনব না। আর তোমার কেসটা কী! ভাল করে বাংলা উচ্চারণ করতে শিখলে না! এত ছটফট কেন? আগে স শ ষ এর পার্থক্য বোঝো। র ড়-এর পার্থক্য বোঝো। নায়িকা হব বলে দু'হাত তুলে চলে এলেই যেন হল। তাও সেকেন্ড নায়িকা হিসেবে তোমার ফিচার আমার স্ক্রিপ্টের সঙ্গে ম্যাচ করেছে বলে তোমায় নিয়েছি। কিন্তু প্রবলেম হল, তুমি অভিনয়টা এখনও পারছ না। বডি ল্যাঙ্গোয়েজ ঠিক নেই। ডায়ালগ বলার সময় হাত কোথায় রাখবে বুঝতে পারছ না। আমি বলে দিচ্ছি, তাও বুঝতে পারছ না। সারাক্ষণ মেক আপ করে ঘুরলেই কি নায়িকা হওয়া যায় নাকি! তোমরা ভাবো সবটাই হাতের মোয়া! এই জন্য থিয়েটার করে আসা ছেলেমেয়েদের আমি প্রেফারেন্স দিই। তারা বেসিকটা জানে কী করতে হয়। আগে এসব শেখো! আর বিজনদাকে কী বলেছ তুমি?"

ইলা উঠে পড়েছিল। মিতুল যা শুরু করেছে আর বসে থাকার মানে ছিল না। ওর সামান্য রাগ হয়েছিল বিজনদার ওপর। আশ্চর্য লোক! সেদিন অমন করে বলল যে, বিজনদা যা বলবে সেটাই করবে, সেখানে বিজনদা কিছুই বলেনি। কী অদ্ভুত! এখানে যে কারও ওপরই কোনওরকম ভরসা করা যাবে না দেখছি।

কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি ইলা। হাল ছাড়তে ও আসেনি এখানে। যখন ঢুকেছে এই লাইনে, এর শেষ দেখে ছাড়বে। তার জন্য যা করতে হয় ও করবে।

যে-ফ্ল্যাটে ওদের ওয়র্কশপ হচ্ছিল তার লাগোয়া একটা ছাদ আছে। সেখানে বড় করে ত্রিপল টাঙানো রয়েছে। স্ট্যান্ড ফ্যানও বসানো আছে কয়েকটা।

সেই ছাদে গিয়েছিল ইলা। তারপর ফোন বের করে কল করেছিল বিজনকে।

"হ্যাঁ বলো, কী খবর?" বিজন ফোনটা ধরে হালকা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

"স্যার, আপনি মিতুলদিকে এখনও কিছু বলেননি?" ইলা সামান্য অভিমান নিয়ে বলেছিল।

বিজন হেসেছিল। বলেছিল, "এটা কী ফিল্ড বলো তো ইলাক্ষী?"

"কী ফিল্ড! কেন সিনেমা!"

বিজন হেসে বলেছিল, "সে তো অন্যদের জন্য। আমার জন্য এটা ব্যবসা। কাজ। এখান থেকে আমি পয়সা রোজগার করি। আমার সংসার চলে। লোকজনকে মাইনে দিই। তাদেরও সংসার চলে। ফলে এখানে সব কিছু অত সাদা-কালো হয় না। বাইনারি হয় না। তুমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলে। আমি পালটা প্রস্তাব দিয়েছি। তুমি মৌখিকভাবে রাজি হয়েছ। কিন্তু সেটা কতটা কাজ করবে সেটা আমি জানি না। তাই একদম রেজাল্ট না পেয়ে কী করে আমি এগোই বলো! মিতুল তোমার অভিনয় নিয়ে খুশি নয়। ওকে সুপারসিড করতে গেলে একটা ঝামেলা লাগবে। তা লাগুক। সে আমি সামলে নেব। কিন্তু তোমার জন্য যে অতটা আমি করব, কেন করব! সেটাও তো আমায় ভাবতে হবে! তোমার দ্বারা আমার কাজ যদি না-হয়, তা হলে তোমার জন্য আমি বলব কেন? তুমি তো আমার বোন, বউ বা মেয়ে নও। তাই না? সবটাই গিভ অ্যান্ড টেক। তাই কিছু রেজাল্ট না-পেয়েই আমি আমার ডিরেক্টরের সঙ্গে কেন বেকার ঝামেলা করব, বলো!"

ইলা বলল, "আমি তো বলেছি আপনি যা বলবেন আমি করব! কিন্তু আমি আমার কথা রাখার পরে যদি আপনি না রাখেন। কাস্টিং কাউচ হচ্ছে তো ব্যাপারটা, তাই না?"

“ঠিক বলেছ। মুখের কথায় কাজ হবে না। আমি যা বলব তোমায় সেটা করতে হবে আর আমিও একটা কনট্র্যাক্ট করব, যেখানে তোমায় ফার্স্ট হিরোইন হিসেবে আমি প্লেস করব। বুঝেছ? আর কাস্টিং কাউচ! হুইসল ব্লোয়িং! সেসব অনেক দেখেছি! শোনো, তুমি আমার কাছে এসেছ প্রস্তাব নিয়ে। আমি যাইনি। ফলে কাস্টিং কাউচ বলে কোনও লাভ নেই,” বিজনের গলায় একটা ঝাঁজ ছিল।

ইলা বুঝেছিল ও ভুল জায়গায় হাত দিয়েছে। বিজন রেগে গেলে খুব মুশকিল। ও বলেছিল, “না না, আমি তা বলিনি। আপনি যা বলবেন সেটাই হবে।”

বিজন হেসেছিল। তারপর সময় নিয়েছিল একটু। বলেছিল, “আমিই তোমায় ফোন করতাম। আজ কাজের পরে আমার বেকবাগানের অফিসে এসো। গাড়ি আছে নীচে। ড্রাইভারকে বলা আছে। কথা আছে তোমার সঙ্গে। আর-একটা কথা...”

“হ্যাঁ স্যার, বলুন।”

“আসার পথে মনোহরপুকুরে নমনের বাড়ি হয়ে আসবে। ওর মায়ের শরীর খারাপ বলে বেচারা আসতে পারেনি। ওর কাছে কিছু প্রিন্টআউট করিয়ে রাখা আছে। পিক দ্যাট আপ ফর মি। ড্রাইভার ওর বাড়ি চেনে। কেমন?”

“ঠিক আছে,” বলে ইলা রেখে দিয়েছিল ফোন।

এখন ওয়র্কশপ শেষ হয়ে গিয়েছে। নিজের জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে দেখছে যে, বাদুদা ফোন করেই যাচ্ছে।

ফোনটাও সাইড ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল ইলা। তারপর মিতুলকে “দিদি আসছি,” বলে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে।

ফ্ল্যাটের নীচে অনেকটা বড় পার্কিং স্পেস। ওকে বিজন গাড়ির নাম্বার মেসেজ করে দিয়েছিল। ইলা দেখল গাড়িটা। নীল রঙের একটা ছোট হ্যাচব্যাক। পুরনো গাড়ি। সঙ্গের ড্রাইভারটি আরও পুরনো।

ইলা গিয়ে দাঁড়াল গাড়ির সামনে। ড্রাইভারটি এগিয়ে এল। তারপর খরখরে গলায় বলল, “আপনি ইলাক্ষী ম্যাডাম?”

ইলা মাথা নেড়ে গাড়ির পেছনের সিটে উঠে পড়ল।

একটাই রক্ষে গাড়িটার ভেতরে এসি আছে। আজকাল কলকাতায় যে-পরিমাণ গরম পড়ে, মানুষ যে-কোনও সময় সান স্ট্রোকে মারা যাবে! আর ইলার সামান্য গরমেই গায়ে লাল লাল র‍্যাশ বেরিয়ে যায়।

ও কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে একটু ভাল করে বসল।

চারদিকে জ্যাম এখন। আকাশ ধূসর হয়ে আছে। গাড়ির হর্নে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। রাস্তার পাশের গাছগুলোয় ধুলো জমে গিয়েছে একদম। দেখে মনে হচ্ছে একটা শহর যেন ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠছে!

ইলা শুনেছে বিদেশ এমন নয়। সেসব জায়গা নাকি খুব সুন্দর! কিন্তু ও কোনওদিন যায়নি। তবে যাবে ও। ওকে অনেক ওপরে উঠতে হবে। এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পরে ও যাবে মুম্বই। দেখবে, সেখানে কিছু করতে পারে কি না! জীবন গতিময়তার নাম। থেমে গেলে হবে না।

গাড়ি এখন রাসবিহারী মোড় পেরোচ্ছে। ইলার সামান্য বিরক্ত লাগছে। এই যে ওকে নমনের ওখানে যেতে হচ্ছে, সেটা ঠিক ভাল লাগছে না। ড্রাইভারটি যখন চিনত ওর বাড়ি, তখন ওকে দিয়েই জিনিসটা আনিয়ে নিতে পারত বিজন। তা নয়, ওকে যেতে হবে। আর বিজন যখন একবার বলেছে, তখন সেটা তো ইলাকে করতেই হবে।

আজকাল নমনকে ও পাত্তা দেয় না। কেন দেবে? কে নমন? হ্যাঁ, বিজনের সঙ্গে ওকে নমন আলাপ করিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, ওকে পিঠে করে সারা জীবন ঘুরতে হবে। এতদিন যে ভাল করে কথা বলেছে এটাই তো অনেক! তার ওপর এখন ও নায়িকা। যার-তার সঙ্গে কথা বলাটা তো ওর মানায়ও না! সেখানে বিজন ওকে এমন একটা কাজ দিল!

গত দু'দিনে বেশ কয়েকবার ওকে মেসেজ করেছে নমন। ও উত্তর দেয়নি। ইচ্ছে করেই দেয়নি। যাতে করে বোঝে যে, ইলা ইন্টারেস্টেড নয়। আর, একবার এই ফিল্মটা হোক। তার পরেই নমনকে ও ব্লক করে দেবে।

ড্রাইভারটি সত্যি নমনের বাড়ি চেনে।

মনোহরপুকুর অঞ্চলে আগে এসেছে ইলা। কিন্তু এই পাড়াটায় আসেনি।

দেখলেই বোঝা যায়, এখানে পুরনো কলকাতার একটা টুকরো এখনও পড়ে আছে।

গাড়িটা রাস্তার একপাশে রেখে ড্রাইভার ওকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, সামনের গলিতে ঢুকেই বাঁ হাতে নমনের বাড়ি।

ইলা ঢুকল গলিতে। গলির মুখে একটা চাউমিনের ঠেলা লাগানো। রাস্তায় নুডলস সেদ্ধর জল, পেঁয়াজের খোসা থেকে শুরু করে ডিমের খোলা সব ছড়িয়ে আছে। দেখেই গা ঘিনঘিন করছে ইলার।

আরে, ওটা কে! ইলা দেখল, মানব আসছে সামনে থেকে।

মিতালির দাদা মানব। এখানে কী করছে!

ও এগিয়ে গেল, "মানবদা তুমি?"

মানব থমকে গেল ইলাকে দেখে। তারপর হাসল, "আরে, একটা কাজে এসেছিলাম। তুই কেমন আছিস?"

"এই চলছে! তোমার ওই কফি শপটার কী হল?"

মানব যে তাড়ায় আছে সেটা বোঝানোর জন্যই ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, "সেই জন্যই এসেছিলাম। তোকে জানাব বুঝলি। আজ আসি। কাজ আছে। লাজনির কাছে যেতে হবে। বাই।"

মানব আর অপেক্ষা না-করে চলে গেল।

লাজনি বলে মেয়েটাকে দেখেছে ইলা। হাই হ্যালোর আলাপও আছে। কেমন যেন রাগী রাগী দেখতে। আর অদ্ভুত ঠান্ডা চোখের দৃষ্টি। চোখে চোখ রাখলে কেমন একটা অস্বস্তি হয় ইলার।

ও সামনে এগিয়ে গেল। গাড়ির ড্রাইভার বাড়ির নাম্বার বলে দিয়েছিল। সেটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না ইলার।

পুরনো দিনের বাড়ি। কাঠের দরজাটা দেখলেই বোঝা যায় সেটা। আর্চের জানলা। তাতে খড়খড়ি লাগানো। বাড়িটার কেমন যেন মারি বিস্কিটের মতো রং। জায়গায় জায়গায় চলটা উঠে গিয়েছে। কতদিন যে রং হয় না কে জানে!

ইলা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কলিং বেল নেই। ও কড়া ধরেই নাড়ল। একটু সময় পরে দরজাটা খুলে গেল।

একটা গোলগলা গেঞ্জি আর বারমুডা পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নমন। ইলাকে দেখে যেন ভূত দেখল ও।

"আরে তুমি!" নমন কী বলবে যেন বুঝতে পারল না।

ইলা বলল, "আমার টাইম নেই। কী একটা প্রিন্টআউট দেওয়ার কথা বিজনস্যার বলছিলেন, সেটার জন্য এসেছি!"

"আবার কে এল গো নমনদা?"

একটা মেয়েলি গলা শুনল ইলা। তারপর দেখল মেয়েটাকে। শ্যামলা লাজুক মুখের একটা মেয়ে। বড় বড় চোখ। তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মেয়েটার পরনে একটা শাড়ি। মাথার চুল এলোমেলো করে বাঁধা।

নমন কিছু না বলে ইলাকে বলল, "ভেতরে আসবে না?"

"না, আজ আসব না। প্রিন্টআউটটা যদি দাও।"

নমন মাথা নাড়ল, তারপর মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

ইলা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। মেয়েটা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

"আপনি ইলাক্ষী?" মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

ইলা মাথা নাড়ল।

"আমি মিনু। এই পাড়াতেই থাকি। নমনদার মায়ের শরীর খারাপ। কেউ তো নেই! সরলামাসিরা দেখে, কিন্তু ওরাও আজ নেই। দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছে।"

"ও আচ্ছা!" ইলা হাসল সামান্য। এসব জেনে ও কী করবে!

নমন ফিরে এল এবার। হাতে একটা প্যাকেট। বলল, "এই যে এতে আছে প্রিন্টআউট। আর সঙ্গে একটা চেকও আছে।"

ইলা খামটা নিয়ে দেখল ভেতরটা। মাথা নাড়ল, "আমি আসি?"

"একবারও আসবে না? শিওর?" নমন যেন শেষ চেষ্টা করল।

"অন্যদিন আসব। আজ হবে না। প্লিজ় ডোন্ট রিকোয়েস্ট মি!" ইলা হেসে পিছন ফিরল। দেখল নমনের মুখ কেমন যেন চুপসে গিয়েছে!

ইলা গাড়িতে ফেরার পথে নিজের প্রশংসা করল। ইচ্ছে করেই ও নমনের মায়ের কথা জানতে চায়নি। কেন চাইবে! এসব সাধারণ সৌজন্যকেই নমনের মতো ছেলেরা আগ্রহ আর প্রেম বলে ধরে নেয়। ওর যেন প্রেম করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই! আজকাল নমনকে দেখলেই গা পিত্তি জ্বলে যায়! গাধা একটা!

বিজনের অফিসে আজ অনেক লোক। তাও ও পৌঁছনোমাত্র ওকে নিজের ঘরে ডেকে নিল বিজন।

ঘরে ঢুকে আগেই খামটা টেবিলের ওপর রাখল ইলা। বিজন কিছু না বলে সেটা তুলে নিল হাতে। তারপর ভেতরটা দেখল। খুশি হয়ে এবার পাশের একটা ড্রয়ার টেনে খুলে খামটা ঢুকিয়ে রাখল সেখানে।

ইলা কী বলবে বুঝতে পারল না। তাকিয়ে হাসল শুধু।

বিজন পাশের একটা কাচের গ্লাস তুলে জল খেল একটু। তারপর বলল, "আই হ্যাভ আ জব ফর ইউ! পারবে?"

"হ্যাঁ পারব," ইলা মাথা তুলে কনফিডেন্টলি বলল।

"আরে, আগে শুনে নাও কী কাজ!" হাসল বিজন। সময় নিয়ে ব্যাগ থেকে একটা সুপুরির প্যাকেট বের করে, তার থেকে কয়েকটা সুপুরি মুখে দিল। তারপর বলল, "এগারো দিন পরে মুম্বই থেকে আমার দু'জন ক্লায়েন্ট আসবে। ওদের সঙ্গে তোমায় সময় কাটাতে হবে। খুব ইমপর্ট্যান্ট লোক। ইউ হ্যাভ টু গিভ দেম ইওর কম্প্যানি অ্যান্ড হ্যাপিনেস! কী বুঝেছ? পারবে?"

ইলার বুকের মধ্যে কেমন গুড়গুড় করে উঠল। অচেনা দু'জন মানুষ! তাদের সঙ্গে ওকে সময় কাটাতে হবে! এ কী বলছে বিজন!

বিজন বলল, "ভেবে নাও আজকের দিনটা। কাল বোলো। এটা খুব ইমপর্ট্যান্ট আমার কাছে। যদি পারো, ফার্স্ট লিড তোমার! হ্যাঁ, তার আগে আই উইল মেক অ্যান এগ্রিমেন্ট উইথ ইউ। তুমি ঠকবে না।"

এমন নির্লিপ্ত মুখে কেউ এসব প্রস্তাব দিতে পারে? ইলা কী বলবে বুঝতে পারল না।

বিজন হাসল, বলল, "মিতুল ফোন করেছিল। শি ওয়ান্টস টু রিপ্লেস ইউ। তুমি নাকি একদম পারছ না। দ্যাখো ইলা, এটা বিজ়নেস। অভিনয় না-পারো, অন্য কিছু তো পারতে হবে! সারভাইভ করতে হলে তোমায় কিন্তু কিছু পারতেই হবে, বুঝেছ? তবে আমি প্রেশার দিচ্ছি না। তুমি চুজ় করো।"

মিতুল ফোন করেছিল! মানে আজ ওই ব্রেক টাইমের কথাগুলোর পরে মিতুল ওর ওপর বিরক্ত হয়েছে। এখন ওকে যদি সত্যি বাদ দিয়ে দেয়!

ইলার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বরফের গিরগিটি হেঁটে গেল যেন! ও দেখল বিজনের চোয়াল নড়ছে। হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। ঘরে গুনগুন করে চলছে এসি। তাও ঘাম হচ্ছে ইলার। কী বলবে ও! কী বলতে পারে! ওর মায়ের মুখ মনে পড়ল। মা যদি এসব জানতে পারে! তখন তো বলেছিল সব পারবে, কিন্তু এখন প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা ঠান্ডা হচ্ছে কেন! জীবনে কিছু পেতে গেলে বিনিময়ে এমন মূল্য দিতে হবে? কেউ কি নেই যে ফেয়ার! সবাই কি সবার কাছ থেকে চাপ দিয়ে কাজ হাসিল করে নিতে চায়? তারপর তাকে ছুড়ে ফেলে দেয়! আচমকা নমনের মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ও কি নিজেও এমন!

ইলার কান গরম হয়ে গিয়েছে। ও চোয়াল শক্ত করল। দেখল, এখনও হাসছে বিজন। স্থিরভাবে হেসেই যাচ্ছে। যেন হ্যাং হয়ে যাওয়া ছবি। কী করবে ইলা? কী উত্তর দেবে? জীবনে উঠতে হলে কি তা হলে নামতেই হবে প্রথমে?

তেরো

আজ বাবু রাত ন'টাতেই দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর বলেছে, "যখন বলছিস, চল যাই তোর সঙ্গে।"

মনোহরপুকুর রোড থেকে সাদার্ন অ্যাভিনিউ পায়ে-হাঁটা পথ। বাস বা অটো নিয়ে বেকার টাকা খরচ করার মানে নেই। তা ছাড়া এত রাতে হেঁটে যেতে খারাপ লাগছে না।

নমনকে আজ ন'টা নাগাদ ছেড়ে দিয়েছে বিজন। তখনই ও ফোন করেছিল মানবকে। বলেছিল, এখন কথা বলতে যেতে পারে কি না।

মানব সামান্য বিরক্ত হয়েছিল। বলেছিল, "এটা কোনও সময়! ঠিক আছে আসুন। সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর ওখানে একটা রেস্তরাঁ কাম বার আছে, 'আন্ডার গ্রাউন্ড' নামে, সেখানে এসে আমায় ফোন করবেন।"

'আন্ডার গ্রাউন্ড!' ওরে বাবা সে যে বিশাল জায়গা! না, নমন কোনওদিন ওসবের ভেতরে যায়নি। কিন্তু সামনে দিয়ে তো গিয়েছে। বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায় কেমন হতে পারে ভেতরটা। সেখানে ওকে কেন ডাকছে মানব!

আসলে গতকাল মানব এসেছিল ওর বাড়িতে। না-বলেই হুট করে চলে এসেছিল আর কী! কী বিপদে যে পড়েছিল নমন!

মায়ের শরীরটা গত পরশু রাত থেকে বেশ খারাপ হয়েছে। আবার সব ভুলভাল কথা বলছে। কান্নাকাটি করছে। হাতের কাছে জিনিস পেলে ছিঁড়ছে, ভাঙছে। খাচ্ছে না। সে যে কী কষ্ট পাচ্ছে!

মিনু না-থাকলে যে কী করত নমন! এদিকে সরলামাসিরা কেউ নেই। তাই মিনু এসে বসছে মায়ের কাছে। আর নমন দেখছে, মা মিনুর কথাই যা শুনছে। মিনুর কোলেই মাথা দিয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা মেয়ের মতো।

এমন একটা পরিস্থিতিতে মানব যে এভাবে এসে পড়বে বুঝতে পারেনি নমন।

ও তখন স্নান সেরে একটা গোল গলা গেঞ্জি আর বারমুডা পরে খেতে বসেছিল সবে। মিনু ওকে বলেছিল খেয়ে নিতে, ততক্ষণ মিনু মায়ের কাছে আছে।

ঠিক সেই সময়ই বাইরের দরজার কড়াটা কে যেন নেড়েছিল। দরজা খুলে নমন দেখেছিল বাইরে মানব দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই লোকটার কথা এক রাতে দোকানে দাঁড়িয়ে মিনু বলেছিল। তারপর একবার দেখাও হয়েছিল ওর সঙ্গে।

মানব ওর ওই বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা দোকানটা চায়। দোকানটা বেশ বড় সেটা ও জানে। লোকেশনটাও ভাল। সেটাকে ভাড়া নিয়ে ও একটা ক্যাফে খুলতে চায়। বিদেশি একটা ক্যাফে ব্র্যান্ড নাকি আসতে চলেছে কলকাতায়। ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে খুলতে চায় দোকান।

তার জন্য মাসে একটা ভাল টাকা ভাড়া দেবে নমনকে। কিন্তু শর্ত একটাই যে, সেলামি কিছু দিতে পারবে না।

সেলামি দেবে না, কিন্তু ভাড়া যেটা দেবে সেটা অনেক! কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না নমন। আর সত্যি বলতে কী, দোকানটা তো বন্ধক পড়ে আছে রুপিনের কাছে! যে-লোকটা বলছে সেলামি দেবে না, সে তো আর রুপিনের কাছ থেকে টাকা দিয়ে দলিল ছাড়িয়ে আনবে না।

মানবের কাছে প্রথম সাক্ষাতে কিছু লুকোয়নি নমন। সব খুলে বলেছিল।

সবটা শুনে মানব বলেছিল, "আপনি দলিলটা ছাড়ানোর ব্যবস্থা করুন। আমি যে-ব্র্যান্ডের কথা বলছি তারা নেক্সট মান্থে আসবে কলকাতায়। তার মধ্যে আপনি ছাড়িয়ে নিন দলিল। আমি ওদের আপনার দোকানটা ভিজিট করিয়ে দেব। এমনিতে ওদের কাছে আমি প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। লোকেশন ওয়াইজ ওদের পছন্দ হয়েছে। আপনার দোকানের স্পেসটাও ভাল। ফলে ব্যাপারটা একরকম 'গো' হয়েই আছে।"

কী যে করবে বুঝতে পারছিল না নমন। এত বড় একটা সুযোগ। তাও কিছু করতে পারছে না। দশ লাখ টাকা দিলেই রুপিন ছেড়ে দেবে দোকান। কিন্তু এতগুলো টাকা ওকে দেবে কে? আর কেনই-বা দেবে! কিছু নেই ওর যে, সেটার বিনিময়ে টাকা নেবে।

ও সেদিন মাথা নিচু করে চলে এসেছিল। তারপর একবার বিজনের কাছেও বলেছিল ব্যাপারটা।

বিজন সব শুনে বলেছিল, "আমি দশ লাখ টাকা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দোকানটা কি তুমি আমায় ওই টাকায় দিয়ে দেবে? দেবে না তো? ওই স্পেসে অত বড় দোকানের দাম কমসে কম তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ। তাই না? ফলে আমি কিছু করতে পারব না। বুঝেছ?"

বিজন সোজা কথা বলে। কোনওরকম এদিক-ওদিক করে না। তাই আর কিছু বলেনি নমন। বলার মুখ নেই যে!

একটা করে দিন কাটছে আর চাপ বাড়ছে নমনের ওপর। একদিকে মায়ের অসুখ আর অন্যদিকে এই টাকার প্রয়োজনীয়তা। রাতে ঘুমোতে পারে না ও ঠিক করে। অসহায় লাগে খুব। মাঝে মাঝে মনে হয়, নিজেকে মেরে ফেলে। কিন্তু তারপরেই ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকা মায়ের দিকে চোখ পড়ে ওর। জানলা দিয়ে রাস্তার আলো এসে পড়ে মায়ের মুখে। কী অসহায় যে লাগে মাকে! ও বোঝে, এই মানুষটার তো ও ছাড়া আর কেউ নেই। সেখানে কী করে নিজেকে মেরে ফেলবে! কলকাতা শহরে নাকি কোটি কোটি টাকা উড়ছে। কিন্তু কোথায় সেই টাকা! কাদের আকাশে সেসব ওড়ে! ওর আকাশে তো শুধু ধুলো, আবছা তারা আর ইলেকট্রিক তারের কাটাকুটি। তা হলে? তা হলে যে-কলকাতার কথা লোকে বলে, সেই কলকাতায় কি থাকে না নমন? ওর কলকাতা কি অন্য? আচ্ছা, সবার কাছেই কি তার তার মতো করে একটা কলকাতা রাখা থাকে!

পরের মাসে রুপিন চলে যাবে, তার আগে টাকাটা জোগাড় করে ফেলতে হবে। না হলে রুপিন বলেছে, ও সেই ক্রেডিটটা অন্য কাউকে বিক্রি করে দেবে। তখন কী করবে নমন! না, আর ভাবতে পারে না ও।

তারপরে হঠাৎ বিকেলে ওই সময়ে এসে হাজির হয়েছিল মানব। কী করবে বুঝতে পারেনি নমন। শুধু মানবকে ঘরে এনে বসিয়েছিল।

মরমে মরে যাচ্ছিল নমন। ছোট্ট ঘর। হতশ্রী। ফাটা দেওয়াল। মাথার ওপর চাঙড়-খসা সিলিং। একপাশে চৌকি। বইয়ের উই-ধরা র‍্যাক আর অন্য পাশে একটা প্লাস্টিকের টুল। তাতে রাখা ভাত, আলুসেদ্ধ আর ডিমের ডালনা। নমন খেতে বসেছিল যে!

মানব খাবারটা দেখে মাথা নেড়ে বলেছিল, "সরি, বুঝতে পারিনি যে আপনি এখনও খাননি।"

"না না, অসুবিধে নেই। বলুন না!" নমন নিজের খাবারটা ঢেকে রেখেছিল একটা প্লাস্টিকের প্লেট দিয়ে।

মানব চৌকির একপাশে বসেছিল। ওর গা থেকে পারফিউমের গন্ধ ছোট্ট প্রজাপতির মতো উড়ছিল ঘরে। নমন দেখছিল, মানবের দামি ঘড়ি, হিসেব করে ছাঁটা দাড়ি, বেবি পিঙ্ক রঙের টি-শার্ট আর ঘন নীল প্যান্ট। সব কিছু থেকেই যেন অর্থ চলকে পড়ছে! ও বুঝতে পারছিল মানব সেই কলকাতার বাসিন্দা, যার আকাশে সত্যি টাকা ওড়ে!

মানব বলেছিল, "নেক্সট মান্থ নয়, ওরা ভিজিটে আসছে দু'সপ্তাহ বাদে। আমি আপনাকে অনেকবার ফোন করেছিলাম। কিন্তু ফোনে পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে এলাম। কিছু মনে করবেন না।"

মিনু পাশের ঘর থেকে এসেছিল। বলেছিল, "চা খাবেন? করে আনি?"

"না না, থ্যাঙ্কস," হেসেছিল মানব, বলেছিল, "জাস্ট এটা বলতেই এলাম। আপনি প্লিজ একটু দেখুন। এখানে না হলে আমায় ওদের অন্য কোথাও দেখাতে হবে। ভবানীপুরে আর-একটা জায়গা দেখেছি। কিন্তু আমার পছন্দ এটাই। তবে আপনি যদি কিছু না করতে পারেন, তা হলে অগত্যা আমায় অন্য কিছু ভাবতে হবে। হারি আপ প্লিজ। আমি আজ আসি। কেমন?"

মানব ঝড়ের মতো এসে ঝড়ের মতোই চলে গিয়েছিল। আর তারপরেই এসেছিল ইলা।

ক'দিন ধরে ইলা কেমন যেন ব্যবহার করছে নমনের সঙ্গে। মেসেজ করলে উত্তর দিচ্ছে না। নমন ভেবেছিল ফোন করবে, কিন্তু ভরসা পায়নি। ওর মন বলছিল, ইলা এবার সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে। মন বলছিল, ইলার ওর থেকে যা নেওয়ার নেওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই বাজে কাগজের মতো ওকে ফেলে দিতে চাইছে।

সেই ইলা ওর বাড়িতে! কেন?

কারণটা বুঝেছিল। বিজন পাঠিয়েছে খামটা নিতে। একটা স্ক্রিপ্ট আর একটা চেক আছে। একজনের কাছ থেকে নিয়ে আসার ব্যাপার ছিল। কিন্তু মায়ের শরীর খারাপের জন্য যেতে পারেনি কাজে। তাই বিজন পাঠিয়েছে ইলাকে।

ইলা ভেতরে ঢোকেনি। বরং বাইরে এমন মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, যেন মনে হচ্ছিল কেউ ওকে বিষ খাওয়ার অর্ডার দিয়েছে!

কোনওরকমে খাম নিয়ে চলে গিয়েছিল ইলা।

মিনু পরে জিজ্ঞেস করেছিল, "ইলা মেয়েটি কি খুব রাগী? এমন কাঠ কাঠ হয়ে থাকে সব সময়?"

কী বলবে নমন? কী বলা যেতে পারে? সত্যি কথাগুলো বলে দেবে! তা হলে তো সেটা নিন্দের মতো শোনাবে! মনে হবে, ওকে পাত্তা দিচ্ছে না বলে ও ইলার নামে খারাপ কথা বলে বেড়াচ্ছে!

এটাই তো চারদিকে দেখে নমন। কেউ কাউকে ছেড়ে গেলেই অন্যজন তার নামে চারদিকে কুৎসা করে বেড়ায়। নানান কথা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, সে কতটা খারাপ। কতটা অকৃতজ্ঞ। খুব বাজে লাগে

নমনের। যে চলে গিয়েছে, তার নামে খারাপ কথা বললে সে কি ফিরে আসবে! সেটা কি সম্ভব!

নমনের আর খেতে ইচ্ছে করেনি। খাবার উঠিয়ে নিয়ে ছোট্ট রান্নাঘরের মিটসেফে তুলে রেখেছিল। ওদের ফ্রিজ নেই। তাই এখানেই খাবার রাখে।

"কী হল, খাবে না?" মিনু অবাক হয়েছিল।

"নাঃ," মাথা নেড়েছিল নমন, "আর ইচ্ছে করছে না।"

কেন ইচ্ছে করছিল না নমনের? মানবের কথার জন্য, না ইলার অমন ব্যবহারের জন্য!

"কী হয়েছে?" মিনু খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করেছিল।

নমন তাকিয়েছিল মিনুর দিকে। মেয়েটার মুখটা চিন্তায় কেমন একটা হয়ে আছে যেন! কেন এমন করে মেয়েটা! কীসের জন্য এত আকুল হয়! সব ছেড়ে এভাবে পড়ে থাকে কেন মায়ের কাছে!

বোঝে, কারণটা বোঝে নমন। কিন্তু সেটা নিয়ে ভাবতে চায় না। ওর দ্বারা কিছু করা যে সম্ভব নয়।

"বললে না কী হয়েছে?" মিনু আবার জিজ্ঞেস করেছিল।

নমন সত্যিটা বলেনি। বরং বলেছিল, "মানববাবুর কথাটা ভাবছি। কী যে করি! কূল পাচ্ছি না কিছু।"

মিনু তখন একটা বুদ্ধি দিয়েছিল ওকে। বলেছিল, "আমার একটা কথা শুনবে? তুমি মানববাবুর সঙ্গে দেখা করো। তারপর ওঁকে বলো যে, ওই টাকাটা তোমায় অ্যাডভান্স দিতে। পরে ভাড়া থেকে কেটে নেবেন। এটা তো ভাল ব্যবস্থা। কনট্র্যাক্টটাও সেভাবে তৈরি করে নিলে, এই নিয়ে আর কোনও ফাঁক থাকবে না। তাই না?"

"কিন্তু উনি যে বলেছেন, সেলামি দেবেন না!" মিনুর দিকে তাকিয়েছিল নমন।

"আরে বাবা অ্যাডভান্স তো! তুমি তো আর পুরো টাকাটা নিয়ে নিচ্ছ না! তাই না? শোনো, এখনকার দিনে কেউ অ্যাডভান্স ছাড়া ভাড়া দেবে না। তোমার অবস্থাটা এমন দেখে উনি চাপ দিচ্ছেন। ভবানীপুরের ওখানেও কি ভেবেছ, এমনি এমনি ভাড়া দিয়ে দেবে? কিছু অ্যাডভান্স নেবে না? বা সেলামি নেবে না?"

"তা হলে?" মিনুর দিকে তাকিয়েছিল নমন।

মিনু বলেছিল, "ফোন করো তুমি। কথা বলো। দেখো, সব ঠিক হয় যাবে।"

তাই আজ ফোন করেছিল। আর তার ফলে এখন যাচ্ছে মানবের কাছে।

মানব রাজি হওয়ায় নমন বাবুকে ফোনে জিজ্ঞেস করেছিল যাবে কী না। আসলে অমন জায়গায় তো একা যায়নি কখনও। অস্বস্তি লাগছিল।

বাবু এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। এখন তাই দু'জনে হাঁটছে।

লেক কালীবাড়ি পার করে আরও একটু গেলেই 'আন্ডার গ্রাউন্ড'। ওরা প্রায় চলেই এসেছে।

বাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এই মানব বলে লোকটা কার সাপোর্টার রে? ওয়েসিসের নাকি নর্থ গার্ডেনের?"

"আরে! এসব কেউ জিজ্ঞেস করে নাকি?" নমন অবাক হয়ে তাকাল বাবুর দিকে।

"আরে, জিজ্ঞেস করতে হয়। না হলে বুঝবি কী করে!" বাবু এমন করে বলল যেন এসব থেকে মানুষের চরিত্র নির্ধারণ করা যায়।

নমন বলল, "শোন, এসব নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না।"

“তুই কিছুই খবর রাখিস না,” বাবু উড়িয়ে দিল নমনকে, “তুই কি ভাবিস ফুটবল এখনও মধ্যবিত্ত আর নিম্ন মধ্যবিত্তের খেলা? ফুটবল এখন এলিটদের খেলা! বুঝলি? এমনি এমনি এত টাকা আসছে! মাঠে গেলে দেখবি কত মেয়ে আসে। ওরাও বিশাল সাপোর্টার। ফেসবুকে দেখবি সারাক্ষণ কী মারামারি হয়!”

“ফেসবুক তো ওইসব করতেই আছে। হয় মুখে মুখে মারামারি করো, নয়তো সব কূপমণ্ডুক সিউডো বিজ্ঞজন মিলে খাপ পঞ্চায়েত বসাও। এক-একদিন এক-একজনকে ধরে তাদের কালি মাখিয়ে নিজেরা স্যাডিস্টিক আনন্দ উপভোগ করো! সব মানসিক অসুস্থরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে! চিপ ডেটা একটা দেশকে মেন্টালি সিক করে দিল!” নমন বিরক্তিতে মাথা নাড়াল।

বাবু ঘাবড়ে গেল। বলল, “ওরে বাবা! তুই চাপে আছিস তো খুব। আসলে আমাদের দলের সাপোর্টার হলে ওই মানব লোকটাকে আমি ম্যানেজ করে নিতাম, তাই বলছিলাম আর কী!”

“তুই চুপ কর। ওই এসে গিয়েছে ‘আন্ডার গ্রাউন্ড’। এখানে দাঁড়িয়ে ফোন করি, কী বল?” নমন জিজ্ঞেস করল।

“যাঃ! ভেতরে ঢুকব না?” বাবু এমন করে বলল যেন রোজ এখানে আসে!

“সেই তো! এক গ্লাস জলের দাম নেবে হয়তো পঞ্চাশ টাকা! দিবি? নাকি সেখানেও ওয়েসিস ক্লাবের মেম্বারশিপ কার্ড দেখাবি?” নমন বিরক্ত হয়ে ফোনটা বের করল।

বাবু বুঝল কথাটা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

কিন্তু নমনকে ফোন করতে হল না। ও দেখল, রেস্তরাঁটার সামনের বড় দরজা খুলে, ঝড়ের মতো বেরিয়ে এল একটা মেয়ে আর তার পেছন পেছন মানব।

দু’জনকে দেখেই নমন বুঝল কিছু হয়েছে।

মানব বলল, “ইউ আর ইমপসিবল টুপু! আরে বাবা কী হয়েছে একটু কোমরে হাত দিয়েছে তো! এমন করছ যেন কী না কী হয়ে গিয়েছে!”

টুপু নামে মেয়েটা চোয়াল শক্ত করে বলল, “আর একটা কথা বললে তোমায় জুতো দিয়ে এখানেই মারব আমি। ইউ গো ইনসাইড টু ইয়োর পার্ভার্টেড ফ্রেন্ডস!”

মানব বলল, “ডোন্ট ক্রস ইয়োর লিমিট! এত নাটক করার কী আছে!”

টুপু বলল, “মানব, জাস্ট গো আওয়ে! সারাক্ষণ আমি অসভ্যতা সহ্য করেছি! আর নয় বলে দিলাম। একটা লিমিট থাকা উচিত সব কিছুর!”

মানব ফুঁসছে। একবার তাকাল টুপুর দিকে। তারপর বলল, “ওকে, গো ফাক ইয়োরসেলফ! গো ইউ স্লাই বিচ!”

টুপু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, “ইউ গো ফাক ইয়োরসেলফ! গো ফাক ইয়োর ফ্রেন্ডস টু!” বলেই হনহন করে হাঁটা দিল।

নমন কী করবে বুঝতে পারল না। এর মধ্যে কি যাওয়া ঠিক হবে! কিন্তু ওর কাজ আছে যে!

নমন এগোল সাহস করে। এবার ওর দিকে চোখ পড়ল মানবের। মানব হাত তুলে বলল, “আজ নয়, আজ কোনও কথা নয়! টু উইকস টাইম আছে আপনার। আজ সিচুয়েশন ঠিক নেই। বাই।”

মানব নমনকে আর কিছু বলতে না-দিয়ে দৌড়ে সামনের বড় দরজাটা খুলে ঢুকে গেল ‘আন্ডার গ্রাউন্ড’-এ।

নমন কী করবে বুঝতে না-পেরে দাঁড়িয়ে রইল।

পাশ থেকে বাবু বলল, “নে, তোর স্বপ্নের পাতাল প্রবেশ হল।”

চোদ্দো

বিনি ভয় পাচ্ছে। আজকাল সারাক্ষণ কেমন যেন একটা ভয় নিয়ে থাকছে মেয়েটা। চোখমুখ শুকিয়ে গিয়েছে। খেতে চাইছে না। সারাক্ষণ কেমন যেন গুটিয়ে থাকছে! কী যে বিপদে পড়েছে ওরা!

রতিশ লোকটা যে এমন করতে শুরু করবে সেটা বুঝতে পারেনি কেউ। থানায় গিয়েছিল সাজু। কোনও লাভ হয়নি। থানা থেকে উলটে ওকেই বুঝিয়ে-বাঝিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়ি। ওরা বলেছে, এসব ঝামেলায় যেন না পড়ে। বলেছে, বাড়ি নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা থাকলে তো আদালত আছে। সেখানে গিয়ে কেস করলেই হয়।

রুনুদি এসব কেস-টেসের ব্যাপারে ঢুকতে চায় না। সবাই জানে আমাদের এখানে একবার কেস শুরু হলে কী পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে।

এত বছর বাইরে থেকে এসে সাজু এমনিতেই হিমশিম খাচ্ছে এখানকার মানুষ ও মানসিকতার সঙ্গে মেলাতে। সেখানে এমন একটা ঝামেলা! কী করে কী করবে বুঝতে পারছে না ও।

আর-একটা জিনিস সাজু দেখেছে। এখানে সব কিছুতেই রাজনৈতিক ইন্টারফেয়ারেন্স এত বেশি যে, বলার নয়! বেঁচে থাকতে গেলে যেন কোনও না-কোনও একটা দিকে তোমাকে ঝুঁকে থাকতেই হবে। তা হলেই অনেক কিছু ঠিক হয়ে যাবে। সঙ্গে রেড টেপ ব্যুরোক্রেসি তো আছেই! মাঝে মাঝে মনে হয়, গণতান্ত্রিকতা ব্যাপারটা যেন কাগজে কলমেই আছে শুধু। আসলে সবটাই যেন সেই পুরনো দিনের মতো ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ হয়ে আছে। এক-একটা অঞ্চলে যেন এক-একজন জমিদার রয়েছে। তাদের অনুগ্রহ না পেলে সুস্থভাবে বেঁচে থাকাই মুশকিল!

রুনুদি লোকাল কাউন্সিলরের কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও পজ়িটিভ কিছু হয়নি। সবাই এক কথাই বলছে। ভাল কথায় মিটিয়ে নিন। আরে, কী মিটিয়ে নেবে! বাড়ি ওদের। সেখানে একটা লোক ঢুকে কবজা করে বসে রয়েছে। বাড়ি তো ছাড়ছেই না, উলটে বাড়িতে এসে উলটোপালটা কথা বলছে। রাস্তায় নানান রকম ঝামেলা করে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে। সেখানে কী মেটাবে! আর সবারই একটা মানসম্মান বলে ব্যাপার আছে। এইসব লোকজন ভাবে, রাজনীতি করে বলে তাদেরই শুধু সম্মান-টম্মান আছে আর বাকি সাধারণ মানুষজন তো এমনি বানের জলে ভেসে এসেছে! ওই ভোটের সময় এদের কাছ থেকে ভোটটা বের করে নিয়ে, এদের খালি রিফিলের মতো ফেলে দিলেই হল!

সাজু বুঝতে পারছে, পনেরো বছর অনেকটা সময়! মনে মনে ও অনেক পালটে গিয়েছে। এখানে যেসব মানুষজন বছরের পর বছর থাকে, তাদের মতো শান্ত হয়ে ধৈর্য ধরে থাকার, অপমান সহ্য করার আর মেনে নেওয়ার ক্ষমতা বহু বছর আগেই চলে গিয়েছে ওর।

ঘড়ি দেখল সাজু। সওয়া পাঁচটা বাজে। ওই বিনি আসছে। মেয়েটা ক'দিন বাড়ি থেকেই বেরোতে পারেনি। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। তাই আজ জোর করেই সাজু ওকে নিয়ে এসেছে স্যারের কাছে

টিউশনে। এভাবে বাড়িতে বসে থাকলে তো ভয় আরও চেপে বসবে! আর ভয় হল সুবিধেবাদী মানুষের মতো। তাকে একবার বসতে দিলে সে শুতে চায়!

বিনির সঙ্গে আরও পাঁচ-ছ'জন আছে। ওরাও সব একসঙ্গে পড়ে। ওদের মধ্যে নাকে আর মাথায় ব্যান্ডেজ করা একটা ছেলেকেও দেখল সাজু। এটাই সেই চিত্ত বলে ছেলেটা, যাকে রতিশ সেদিন পিটিয়েছে।

সাজু নিজেই এগিয়ে গেল ওদের দিকে। বিনিরাও একই সময়ে এসে দাঁড়াল সামনে।

সাজু জিজ্ঞেস করল, "তুমি চিত্ত, না? শরীর কেমন আছে?"

চিত্ত ছেলেটা হাসল সামান্য। সাজু বুঝল, হাসতেও কষ্ট হচ্ছে ওর।

চিত্ত বলল, "ব্যথা আছে। তবে অসুবিধে নেই। আপনি কি বিনির দাদা?"

বিনি হাসল। বলল, "দূর, মামা হয় আমার! সেই যে ফ্লোরেন্সে থাকে। সরযু। বলেছি না!"

সাজু হাসল, "ওরে মেয়ে! নাম ধরে ডাকিস বুঝি তুই আমায়!"

চিত্ত বলল, "দেখুন না, কী ভিতু মেয়ে! সারাক্ষণ ঘরে লুকিয়ে বসে আছে! আরে এটা তো শহর। জঙ্গল তো নয় যে, যার যা খুশি করবে! তাই না?"

বিনি চোয়াল শক্ত করে বলল, "জঙ্গল এর চেয়ে ভাল হয়। সেখানে খিদে না পেলে কেউ কাউকে আক্রমণ করে না। এখানে মানুষজন তো রাক্ষস হয়ে যাচ্ছে পুরো! সেদিন মনে নেই কী হল! তারপরেও যদি ভয় না লাগে তো কবে লাগবে!"

চিত্ত হাসল, "আরে দূর! লোকটা গুন্ডা। আমি বুঝতে পারিনি। পরের বার আসুক, আমি রেডি থাকব।"

বিনি আরও রেগে গেল। বলল, "এটা কি আনসিভিলাইজড সোসাইটি নাকি? তৈরি থাকবি মানে? নাকি এটা সলমন খানের সিনেমা? তুই মুম্বই চলে যা। হিরো এসেছে! ইডিয়ট!"

ব্যথা সত্ত্বেও হাসল চিত্ত। বলল, "সেদিন তোর এই তেজ যে কোথায় ছিল!"

সাজু বুঝল, বিনির সঙ্গে ছেলেটার শুধু যে বন্ধুত্ব আছে তা নয়, আরও বেশি কিছু আছে। ওর হঠাৎ নিজেকে বাড়তি মনে হল এদের মধ্যে। ও বলল, "বিনি তুই কি আমার সঙ্গে ফিরবি? নাকি বন্ধুদের সঙ্গে একটু সময় কাটাবি?"

সাজু দেখল কথাটা শুনে বিনি চট করে তাকাল চিত্তর দিকে। চিত্তও যেন ইশারায় বলতে চাইল থেকে যেতে।

বিনি বলল, "ঠিক আছে, আমি ওদের সঙ্গে একটু থাকি। তা ছাড়া ভয় পেলে তো পাওয়াই যায়, তাই না! আমি আর ভয় পাচ্ছি না। যা হবে হোক। কেমন? তুমি এসো মামু।"

সাজু হাসল। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় পা রাখল।

একবার গড়িয়াহাটে যাবে। রেমির জন্য একটা কিছু কিনতে চায় ও। আর কিছুদিন বাদে চলে যাবে সাজু। তার আগে কিছু একটা দিয়ে যেতে চায় মেয়েটাকে। এই ক'দিনেই বড্ড মায়ায় জড়িয়েছে।

আজ সকালেও এসেছিল মেয়েটা। সাজু তখন স্নান সেরে একটা বই নিয়ে বসেছিল। সেই সময় হইহই করে এসে ঢুকে পড়েছিল।

সাজু ওকে দেখে হেসেছিল।

রেমি বলেছিল, "তুমি সারাক্ষণ বই পড়ো কেন বলো তো?"

"সারাক্ষণই পড়তে চাই। কিন্তু পারি আর কই! তাই যেটুকু সময় পাই পড়ি আর কী!"

রেমি বলেছিল, "ওই ফ্লোরেন্সে থাকলেও এমন করো? সারাক্ষণ বই পড়ো?"

সাজু বলেছিল, "তা একটু পড়ি সময় পেলেই। আজ হঠাৎ বই নিয়ে এত প্রশ্ন হচ্ছে কেন?"

রেমি বলেছিল, "আমি বই দু'চক্ষে সহ্য করতে পারছি না। দাদু-দিদার বাড়িতে এসেছি ঘুরব বলে, কিন্তু মা সেখানেও পড়ার বই নিয়ে এসেছে! তুমি বলো, পড়াশোনা করতে কি ভাল লাগে?"

সাজু বলেছিল, "কিন্তু না-করেও যে উপায় নেই। তাই না? মা তো ভাল চায় তোমার। তাই পড়তে বলে। তুমি ভাল রেজাল্ট করলে কার লাভ হবে বলো? মায়ের না তোমার?"

রেমি চুপ করে থেকেছিল। তারপর এসে দাঁড়িয়েছিল জানলায়। এই দিকের জানলা দিয়ে মেমদিদার বাড়ির বাগান দেখা যায়।

রেমি আচমকা বলেছিল, "আমি তো তোমার বন্ধু, তাই না?"

"হ্যাঁ তো। বন্ধুই তো," হেসেছিল সাজু।

"তা হলে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"হ্যাঁ, কী জানতে চাও বলো," সাজু বইটা ভাঁজ করে তাকিয়েছিল রেমির দিকে।

"আচ্ছা, তোমার সঙ্গে মায়ের প্রেম ছিল?" রেমি জানলা থেকে ঘুরে তাকিয়েছিল সাজুর দিকে।

সাজু চমকে উঠেছিল। এ কী বলছে মেয়েটা! এসব ওকে কে বলেছে?

রেমি জানলা ছেড়ে এসে বসেছিল ওর পাশে। তারপর বলেছিল, "আমি শুনেছি। মা আর মেমদিদার কথা হচ্ছিল। মা তোমায় ছেড়ে গিয়েছিল, না? বাবাকে মায়ের পছন্দ ছিল বলে গিয়েছিল?"

সাজু হেসেছিল এবার। তারপর রেমির মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে গিয়েছিল বিছানা থেকে। বলেছিল, "এসব কথা কেন বলছ তুমি? যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। বাদ দাও।"

"আসলে মা গতকাল মেমদিদার কাছে গিয়ে দুঃখ করছিল। জানো তো, বাবার সঙ্গে মায়ের আজকাল মাঝে মাঝেই খুব ঝামেলা হয়। বাবার কাজের প্রেশার বেড়েছে। মদ খেয়ে আসে মাঝে মাঝে। প্লাস কোন এক নার্স না কে তার সঙ্গেও বাবার একটা অ্যাফেয়ার হয়েছিল মাঝে। সেই নিয়েও খুব ঝামেলা হয়েছিল। মা তো বলেছিল ডিভোর্স দেবে। সেসব নিয়েই কথা বলছিল মেমদিদার সঙ্গে। তখন মেমদিদা বলল যে, 'এখন এসব বলে কী হবে? তুই তো নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিস! আমাদের তো পছন্দই ছিল সাজুকে। তুই তো ওর সঙ্গে রিলেশনে গিয়েও নিজেই ওকে ছেড়ে দিলি...' আচ্ছা, তোমার মায়ের ওপর রাগ হয় না?"

সাজু মাথা নেড়েছিল, "বাপরে, তুমি তো সত্যি বড় হয়ে গিয়েছ!"

"বলো না, রাগ হয় না?" রেমি তাকিয়েছিল সাজুর দিকে, "আমি প্রায় ফোরটিন। বুঝব না কেন? আর আমি তোমায় খুব পছন্দ করি। মা এত বোকা! কেউ তোমায় ছাড়ে!"

সাজু বলেছিল, "তুমি এসব নিয়ে ভেবো না। বহু পুরনো দিনের কথা। আমাদের সবার একটা পাস্ট থাকে। সেটা পাস্টে রাখাই সবচেয়ে ভাল। তোমার মাকে আমি সেই ছোট থেকে চিনি। তাই ওর আমার প্রতি একটা সফট কর্নার ছিল। কিন্তু পরে তোমার বাবাকে দেখে। দে ফেল ইন লাভ। আর সব সম্পর্কেই একটা চড়াই-উতরাই আছে। একসঙ্গে দীর্ঘদিন থাকলে অমন হয়। লাবণ্য যা করেছে ঠিকই করেছে। আর তুমি এসব নিয়ে

ভেবো না। তোমার সামনে বড় একটা জীবন পড়ে আছে। জানবে বাবা-মা তোমায় সবচেয়ে ভালবাসে। ওইটুকু মনে রেখো। কেমন?”

রেমি তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর বলেছিল, “তুমি এখন কাকে ভালবাস, মাকে না টুপুমাসিকে?”

“কী!” সাজু চমকে উঠেছিল।

রেমি বলেছিল, “জানোই তো মেয়েরা একটু বেশি ম্যাচিওর্ড হয়। আর ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধিও বেশি থাকে। তাই না? ফলে ইউ ক্যান নট ডিসিভ মি। বলো আমায়!”

সাজু কিছু উত্তর দেয়নি এর। শুধু কথা ঘোরাতে বলেছিল, “তুমি দাবা খেলো? চেস? খেলো?”

রেমি ভুরু কুঁচকে বলেছিল, “হ্যাঁ। খুব ভালবাসি। আমার এজ গ্রুপে আমি মহারাষ্ট্র স্টেট রানার্স। কেন?”

“এমনি,” সাজু হেসে বলেছিল, “আমরা খেলব, কেমন?”

“আর আমি যদি জিতি, তা হলে আমি যা জানতে চাইব সেটার উত্তর দেবে কিন্তু। কেমন?” রেমি মুখচোখ সিরিয়াস করে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

সাজু বলেছিল, “তোমার মাও এমন জেদ করত!”

রেমি বলেছিল, “আমি আরও জেদি!”

সাজু গড়িয়াহাটে নামল। ভিড় চারদিকে। এই জায়গাটায় সারাক্ষণ ভিড় থাকে। এখানে একটা বড় খেলনার দোকান ছিল। এখনও কি আছে! বহুদিন এদিকে আসেনি ও।

মানুষজন কাটিয়ে রাস্তা থেকে ফুটপাথে উঠল সাজু। এখানে ফুটপাথে হাঁটাই দায়। চারদিকে এত দোকান যে, ফুটপাথ ঢেকে গিয়েছে একদম। বিদেশে থাকতে থাকতে এই একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। বেশি লোক দেখলেই কেমন যেন লাগে ওর। সেই জন্য প্যারিসও ভাল লাগে না সাজুর। অধিকাংশ বাঙালি ‘প্যারিস প্যারিস’ করে লাফালেও, ওর খুব বাজে লাগে ওই শহরটাকে।

এখানে অবস্থা ওর চেয়েও অনেক শোচনীয়। দু’পাশের দোকান আর সামনে মানুষদের অলস হাঁটার জন্য স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করাই দায়।

তাও কিছুটা সময় নিয়ে দোকানটা খুঁজে পেল সাজু। দেখল, একই আছে দোকানটা। ভেতরে লোকজনও একই রয়ে গিয়েছে।

ও দোকানটা থেকে একটা দাবার সেট কিনল। কাঠের। রাজা, মন্ত্রী, গজ, বোড়েগুলো দেখতে একদম আলাদা। দাবার সেটটা গিফট প্যাক করিয়ে নিল সাজু। চলে যাওয়ার আগে এটা দিয়ে যাবে রেমিকে।

গড়িয়াহাটের ফ্লাইওভারের কাছ থেকে বাড়ি ফেরার একটা হলুদ ট্যাক্সি পেয়ে গেল সাজু। আর কোথাও যাওয়ার নেই। তা ছাড়া শরীরটাও ঠিক লাগছে না। আজকাল কিছুতেই ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না। কেন কে জানে, কিন্তু কলকাতায় আসা ইস্তক ভাল করে ঘুমোতেই পারছে না ও। গত কয়েকদিন তো অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এই যে রাতে ঘুম হচ্ছে না, তাতে সারা দিন কী যে খারাপ লাগে শরীর। আর এই বিকেলের দিকে ঘুম পায়। কিন্তু এখন ঘুমোলে আরও সমস্যা। রাতে যে দু’-এক ঘণ্টা ঘুম হয় সেটাও হবে না।

সেদিন এটা নিয়েই কথা হচ্ছিল লাবণ্যর সঙ্গে। লাবণ্য বলছিল, “তোকে এমন ক্লান্ত লাগছে কেন? কী হয়েছে তোর?”

সাজু বলেছিল, "ওই ঘুমের প্রবলেম।"

লাবণ্য ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "এখনও রাত জেগে সিনেমা দেখিস? পড়িস?"

সাজু কিছু না বলে হেসেছিল।

লাবণ্য বলেছিল, "কতবার তোকে না করতাম। আমার কোনও কথাই যদি শুনতিস কোনওদিন!"

সাজু মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। ও নাকি লাবণ্যর কথা শোনেনি! না শুনলে কি লাবণ্য আর এইভাবে থাকতে পারত!

লাবণ্য বলেছিল, "ডাক্তার দেখিয়ে ঘুমের ওষুধ খা। আর গালে এটা কী লেগে আছে!"

লাবণ্য হাত দিয়ে সাজুর গালে লেগে থাকা একটা ছোট্ট কুটো সরাতে গিয়েছিল আর তখনই সাজু দেখেছিল টুপুকে।

সেদিনের পর থেকে টুপু ঠিকমতো কথা বলছে না ওর সঙ্গে। এই যে গতকাল আবার গিয়ে বাবুই পাখিটার বাসা বানানো দেখছিল, টুপু অফিস থেকে ফেরার পথে দেখেছিল ওকে। সাজু হাত তুলে ডেকেওছিল। কিন্তু টুপু চলে গিয়েছিল উত্তর না-দিয়ে। খুব অপমানিত বোধ করেছিল সাজু। কেন এমন করছে মেয়েটা!

বাড়ির সামনে গিয়ে ভাড়া মিটিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিল সাজু। আর তখনই ফোনটা এল। এখন আবার কে! আরে আলেসান্দ্রো!

ফোনটা ধরল সাজু, "হ্যাঁ বলো।"

আলেসান্দ্রো বলল, "সাজু, তোমায় একবার নেক্সট উইক আমদাবাদ যেতে হবে। একটা পার্টিকে আমরা লোগো বানাতে দিয়েছিলাম। কিছু প্রবলেম হয়েছে। দু'-এক দিনের কাজ। সেরে আসতে হবে। পারবে তো?"

"শিওর। আমি দেখে নিচ্ছি।"

আলেসান্দ্রো বলল, "জব ডিটেল উইথ টিকেট তোমায় মেসেজ করে দিচ্ছি। কেমন?"

সাজু বলল, "ওকে লিভিং নেক্সট উইক দেন।"

ফোনটা কেটে পকেটে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোল সাজু।

"সো নেক্সট উইক!"

সাজু ঘুরল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে টুপু। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অফিস থেকে আসছে।

সাজু কী বলবে বুঝতে পারল না।

টুপু আবার বলল, "লাবুদি জানে তুমি নেক্সট উইক চলে যাচ্ছ?"

সাজু কিছু বলতে গেল। কিন্তু টুপু বলতে দিল না। হাত তুলে বলল, "লেট মি গেস। এই মাত্র খবর পেলে। আর এবার সেটাই লাবুদিকে ফার্স্ট জানাবে, রাইট?"

"কী বলছ তুমি?" সাজু অবাক হল।

"আমি কিছু বলছি না তো! আমি কে! কিছু বলার নেই। তুমি কিছু বলো আমায়? আমায় তো এটাও বলোনি যে, রুনুদির লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাট নিয়ে খুব ঝামেলা হচ্ছে!"

সাজু বুঝতেই পারল না টুপু কী বলতে চাইছে।

“কী হয়েছে তোমার টুপু? রাগ করছ কেন? আর তুমি কী-ই বা করতে পারতে, বলো!” সাজু অবাক হয়ে তাকাল।

টুপু বলল, “সেই। আমি কে! আমি কী-ই বা করতে পারি! আর আমি রাগ করারই-বা কে? তবে এটা মনে রেখো, লাবুদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। পুরনো প্রেম রিকিন্ডল হওয়া ব্যাপারটা স্বাস্থ্যকর নয়। আর যে তোমায় একবার ছেড়ে গিয়েছে সে আবার যাবে। প্রত্যেকটা মানুষের একটা প্যাটার্ন থাকে।”

“কিন্তু আমি কী করেছি? তুমি এসব আমায় বলছ কেন?”

টুপু চোয়াল শক্ত করে তাকাল ওর দিকে। সন্ধে হয়ে আসছে এখন। পাখিদের কিচিরমিচির বেড়ে গিয়েছে খুব। আলো প্রায় নিভে এসেছে পৃথিবীর। তার মধ্যেও সাজু বুঝল টুপুর মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে। ওর খুব অসহায় লাগল। কেন এমন করছে মেয়েটা! সেদিন যেভাবে লাবণ্যকে ওইসব কথা বলে নিজের বয়ফ্রেন্ডের গাড়িতে গিয়ে বসল, সেটা নিয়ে কি কিছু বলেছে সাজু! ওর কি খারাপ লাগেনি! লেগেছে তো! কিন্তু নিজেকে এসব থেকে সরিয়ে রাখতে চায় ও। টুপু এমন করছে কেন?

টুপু তাকাল সাজুর দিকে। তারপর বলল, “কারণ, আমার মাথা খারাপ। আমি পাগল, তাই।”

সাজু কিছু বলতে গিয়েও পারল না। ও দেখল, টুপু হনহন করে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

পনেরো

কলকাতাকে আজকাল একটা বড় অন্ধকার কুয়োর মতো মনে হয় টুপুর। মনে হয়, ও পড়ে গিয়েছে সেই কুয়োর মধ্যে, কিন্তু আর উঠতে পারছে না। কষ্ট হয় ওর। মনখারাপ করে। কিন্তু বোঝে যে, কিছু করার নেই। জীবনটা যেন চারদিক দিয়ে ওকে চেপে ধরেছে। কিছুতেই এর থেকে বেরতে পারছে না।

মাঝরাতে আজকাল ঘুম ভেঙে যায় ওর। ঘরে থাকতে কেমন যেন বদ্ধ লাগে। এসি অফ করে ও বেরিয়ে আসে বারান্দায়।

ওদের বারান্দাটা খুব সুন্দর। লম্বা, টানা। আকারে ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো। সেই বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় বাগানের দিকটায়। পাঁচিলের ওই দিকে সাজুদের বাড়ি। দেখে, সেখানে আলো জ্বলছে সাজুর ঘরে। খোলা জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে সাজুকেও দেখা যায়। বই পড়ছে বা ল্যাপটপ খুলে দেখছে।

দেখলেই মনের মধ্যে কেমন একটা করে টুপুর। মনে হয় বুকের ভিতরের কানায় কানায় ভরা বাটিটা চলকে পড়ে যাবে। এসব কেন হচ্ছে! বেশ তো ছিল ও। সেই পনেরো বছর আগে যাকে ভাল লাগত সেই ভাললাগা যে কোনওদিন প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণ হবে না, সেটা তো মেনেই নিয়েছিল। আর সত্যি বলতে কী, ভেবেওছিল যে, এসব পুরনো ব্যাপার। অল্প বয়সের ইনফ্যাচুয়েশন! কিন্তু কে জানত যে, কিছু জিনিস আছে যা মরেও মরে না!

নিজেকে মাঝে মাঝে চড়াতে ইচ্ছে করে টুপুর! কেন ভাল লাগে ওর সাজুকে! সাজু তো অদ্ভুত এক ঠান্ডা, নিস্পৃহ আর কেমন একটা দূরত্বে ভেসে থাকা মানুষ। তা ছাড়া শুনলই তো গত দু'দিন আগে যে, ও চলে যাচ্ছে আবার! তা হলে কীসের জন্য এই টান! নিজেকে কষ্ট দিয়ে কি মহৎ হতে চায় টুপু? বোকামোর একটা মাত্রা তো থাকবে! এত ন্যাকা তো কোনওদিনও ছিল না ও!

সামনে টেবিলে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল হঠাৎ। চায়ের কাপটা রেখে ফোনটা দেখল টুপু। আরে, রুনুদি ফোন করেছে।

ও ফোনটা তুলল, "রুনুদি বলো।"

"টুপু, তোর মনে আছে তো?" রুনুদির গলাটা কেমন যেন শোনাল।

"মনে আছে রুনুদি। আজ স্যার এসেছেন। আমি আজই কথা বলব। তুমি ভেবো না একদম! মনখারাপও করবে না কিন্তু। আমি দেখছি। ভরসা রাখো।"

রুনুদি আবার কেমন যেন ইতস্তত করল একটু।

"আর কিছু বলবে?" টুপু জিজ্ঞেস করল।

রুনুদি বলল, "তুই কি সাজুকে কিছু বলেছিস?"

"মানে? কী বলব?" টুপু মুখে জিজ্ঞেস করলেও মনে মনে একটু দমে গেল।

"রাগ করেছিস! সাজু বলছিল, টুপু কেন রাগ করেছে বুঝতে পারছি না!" রুনুদির গলাতেও বিস্ময়।

টুপু হাসল, "আরে, কিছু নয়। পরে বলব। আমি এখন রাখি। স্যার বেশ কয়েকদিন পরে এলেন অফিসে। দেখা করে আসি। কেমন?"

রুনুদি ফোন রেখে দিল।

টুপু জোরে শ্বাস নিল একটা। আজ মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ভাল লাগছে না কিছু। সকাল থেকে মনে হচ্ছে আজ দিনটায় কী যেন ঠিক নেই। কী যেন একটা গোলমাল হবে।

বাড়িতেও মায়ের সঙ্গে আজ একটু ঝামেলা হয়েছিল। আসলে বাবা চা খেতে গিয়ে হাত থেকে কাপ ফেলে ভেঙে ফেলেছিল। মা সেই নিয়ে প্রচণ্ড রাগ করছিল।

টুপু অফিসে বেরবে তখন। সেই সময় মায়ের মেজাজ দেখে ওর নিজের মাথাও গরম হয়ে গিয়েছিল। মাকে বলে বলে পারা যায় না। এমনিতেই বাবা গুটিয়ে থাকে। একবার সুইসাইড করতে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই ডিপ্রেশনে ভোগে। তাকে সারাক্ষণ দোষ দিয়ে কী হবে! যা হয়ে গিয়েছে সেটা তো পালটানো যাবে না!

টুপু মাকে বলেছিল, "একটা দিন, কেবল একটা দিন অশান্তি না-করে দ্যাখো, ভাল লাগবে। তোমার যা গলা হয়েছে তাতে কোনও পলিটিকাল পার্টি জয়েন করো, তারপর সন্ধেবেলায় টিভির কোনও চ্যানেলে বসে গলাবাজি কোরো।"

"আমার গলাটাই তো তুই দেখবি! তোর বাপ কী করেছে দেখেছিস! এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই সে কিনা কাপ ভাঙে!"

টুপু দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, "মা, যথেষ্ট হয়েছে। আর একটা কথা বললে আমি কিন্তু এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব বলে দিলাম।"

মা আর কিছু বলেনি। টুপুও অফিসে চলে এসেছিল। কিন্তু মনখারাপটা রয়েই গিয়েছে। কেমন একটা তেতো হয়ে আছে মুখটা। মনে হচ্ছে সব ছেড়ে কোথাও চলে যায়।

কিছু কাজ ছিল। সেগুলো খুব জোর করে করেছে ও। ইচ্ছে করছিল না কাজ করতে। কিন্তু জানে কাজটা ওর। আর করতে ওকেই হবে।

মোহিতস্যার ক'দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। গতকাল রাতে ফিরেছেন। আজ একটু দেরি করে অফিসে এসেছেন।

এখনও মোহিতের চেম্বারে যায়নি টুপু। তবে এবার যাবে। কয়েকটা জিনিসে সইও করাতে হবে। আর ওর কিছু কথাও আছে! দুটোই হয়ে যাবে।

গত কয়েকদিন আগে রুনুদির সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল টুপুর। আসলে টুপু সকালে বেরয় আর শেষ বিকেল বা সন্ধেবেলা করে বাড়ি ফেরে। তারপর কখনও মানবের সঙ্গে বেরয় কখনও বাড়িতেই থাকে। অন্য কোথাও খুব একটা যাওয়া হয় না।

রুনুদিকে এই সবই বলছিল ও। কারণ, রুনুদি অনুযোগ করেছিল যে, টুপু ওদের বাড়িতে একটুও যায় না।

তারপর রুনুদি নিজের কথা বলছিল। আর তখনই জানতে পেরেছিল লেক গার্ডেন্সের বাড়ি নিয়ে ঝামেলার কথা। জেনেছিল, কী করে রতিশ নামে একটা লোক বিনির পেছনে পড়েছে। লোকটা কেমন রূঢ়ভাবে কথা বলেছে। প্রচ্ছন্ন হুমকি দিচ্ছে। এমনকী, রাস্তায় একদিন নাকি মারামারিও হয়েছে বিনির এক বন্ধুর সঙ্গে। এসব নিয়ে সাজুও খুব চিন্তায় আছে।

সবটা শুনে বেশ ভয়ই লেগেছিল টুপুর। আর মনে পড়ে গিয়েছিল একদিন বিনি কেমন ভয় পেয়ে ওর সামনে থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সাজুকে।

সাজু এসব কিছু বলেনি ওকে। কিচ্ছু না। কেন বলেনি! কারণ, টুপুকে কিছু মনেই করে না যে!

টুপু বলেছিল, "আমি দেখছি ব্যাপারটা নিয়ে। রতিশ লোকটার যে-ডিটেল দিলে সেটা ঠিক তো? আর-একটা কথা, এই ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা যে তুমি আমায় বলেছ, সেটা সাজুদাকে বলবে না। আর যাকেই কিছু বলো না কেন, সাজুদাকে কিন্তু কিচ্ছু বলবে না। বুঝলে তো? কিচ্ছু না।"

টুপু উঠল চেয়ার ছেড়ে। ওকে একটা আলাদা কেবিন করে দিয়েছে মোহিত। কেবিনটা ছোট, কিন্তু সুন্দর করে গোছানো। কাচের দরজার ওদিকে ছড়ানো কিউবিকলগুলোর কোনও আওয়াজ আসে না এখানে। ওর টেবিলের পাশে জানলা আছে। আটতলা থেকে রাস্তার পিঁপড়ের মতো মানুষ দেখা যায়। কাজ না থাকলে ওই রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে টুপু। কিন্তু আজ সেটাও ইচ্ছে করছে না ওর।

ও ফাইল দুটো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মোহিতের সই লাগবে এই দুটোয়।

কেবিনের বাইরে বেরতেই একটা গুঞ্জন যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। আশপাশ থেকে দু'-একজন কিছু বললও। কিন্তু পাত্তা দিল না টুপু। অফিসে সবাই জানে টুপু খুব রাগী। তাই কেউ ওকে বিশেষ ঘাঁটায় না।

ফাইলটা নিয়ে চা-টিফিনের কিউবিকলের দিকে এগোল টুপু। জল খাবে একটু। আর খিদেও পেয়েছে। দেখবে, ওখানে বিস্কিট-টিস্কিট কিছু পাওয়া যায় কি না! আসলে মায়ের সঙ্গে ঝামেলা করার পর আর কিছু খাওয়া হয়নি। মনখারাপ থাকলে ওর খিদে চলে যায়।

মোহিতের ঘরে যেতেও আসলে ওর কেমন একটা করছে। গত কয়েকদিন আগে এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে যে, সেটা নিয়ে মোহিত কিছু জিজ্ঞেস করলেই বিপদ।

আসলে মাঝে একদিন মানবের সঙ্গে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ওপরে 'আন্ডার গ্রাউন্ড' নামে একটা বার কাম রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল টুপু। না, ও যেতে চায়নি। ক্লান্ত ছিল খুব। কিন্তু মানব এমন জোর করেছিল যে, বাধ্য হয়েছিল যেতে।

গোটা পথটা চুপচাপ ছিল টুপু। এমনকী, ওখানে পৌঁছেও। দেখেছিল, মানবের স্কুলজীবনের কয়েকজন বন্ধু এসে জড়ো হয়েছে। ওদের মধ্যে নিজেকে কেমন যেন বেমানান লাগছিল টুপুর। ওকে ড্রিঙ্ক অফার করেছিল মানব, ও নেয়নি। মানব তারপর বলছিল, টুপু নাচবে কি না! টুপু না বলেছিল।

সামান্য দূরে একটা চকচকে ফ্লোরে আলো আর গানের তালে নাচছিল কয়েকজন। টুপুর কিছু ভাল লাগছিল না।

ঘণ্টাখানেক সময় কাটানোর পরে টুপু বলেছিল ও বাড়ি যেতে চায়। কিন্তু মানব জেদ করছিল। থাকতে বলছিল আরও।

আর এরই মধ্যে মানবের এক বন্ধু পুলক, এসে টুপুকে বলেছিল, "লাজনি কাম অন লেটস ডান্স!"

"না, ভাল লাগছে না। সরি," টুপু মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। এক কথা কতবার বলা যায়!

"আরে প্লিজ। ডোন্ট বি আ স্পয়েল স্পোর্ট! কাম না," আচমকা টুপুর হাত ধরে ওকে চেয়ার থেকে টান মেরে তুলে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছিল পুলক।

"আরে," টুপু ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল পুলককে, "হাউ ডেয়ার ইউ!"

সবার সামনে ধাক্কা খেয়ে পুলক ঘাবড়ে গিয়েছিল বেশ। আর পরমুহূর্তে নিজের অসভ্যতা ঢাকতে বলেছিল, "ফাক ইউ মিডল ক্লাস বিচ! কাকে নিয়ে এসেছিস মানব! জংলি সব!"

মানব বলেছিল, "কী হল টুপু! কেন এমন করছ!"

টুপু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, "আমি করছি! আমায় কেউ গালি দিচ্ছে, খারাপভাবে টাচ করছে আর তুমি আমাকেই বলছ! টু হেল উইথ ইউ অ্যান্ড ইওর বাডিজ!"

বলে টুপু আর দাঁড়ায়নি। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। মানব পেছন পেছন এসেছিল দৌড়ে।

মানব বলেছিল, "ইউ আর ইমপসিবল টুপু! আরে বাবা কী হয়েছে একটু কোমরে হাত দিয়েছে তো! এমন করছ যেন কী না কী হয়ে গিয়েছে!"

টুপু চোয়াল শক্ত করে বলেছিল, "আর একটা কথা বললে তোমায় জুতো দিয়ে এখানেই মারব আমি। এখানেই মারব। ইউ গো ইনসাইড টু ইয়োর পার্ভার্টেড ফ্রেন্ডস!"

মানব বলেছিল, "ডোন্ট ক্রস ইয়োর লিমিট! এত নাটক করার কী আছে!"

টুপু চিৎকার করে বলেছিল, "মানব, জাস্ট গো আওয়ে! সারাক্ষণ আমি অসভ্যতা সহ্য করেছি। আর নয় বলে দিলাম। একটা লিমিট থাকা উচিত সব কিছুর!"

মানব ফুঁসছিল। তারপর চোয়াল শক্ত করে বলেছিল, "ওকে, গো ফাক ইয়োরসেলফ! গো ইউ স্লাই বিচ!"

টুপু সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ইউ গো ফাক ইয়োরসেলফ! গো ফাক ইয়োর ফ্রেন্ডস টু।"

দু'দিন পরে মানব কল করেছিল টুপুকে। টুপু ধরেছিল ফোনটা।

মানব বলেছিল, "আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আমাদের আর রিলেশন না-রাখাই ভাল মনে হয়।"

টুপু সামান্য অবাক হয়েছিল বটে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, খারাপ লাগেনি। বরং কেমন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচার মতো একটা ফিলিং হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এটাই তো ও চাইছিল। কিন্তু মোহিতস্যারের কথা ভেবে বলতে পারছিল না।

মানব বলেছিল, "তোমার কিছু বলার নেই?"

টুপু বলেছিল, "ভাল কথায় বললে, বলতে ইচ্ছে করছে থ্যাঙ্ক ইউ।"

মানব জিজ্ঞেস করেছিল, "আর খারাপভাবে বললে?"

"ফাক অফ," বলে ফোনটা কেটে দিয়েছিল টুপু।

খাবারের কিউবিকলটায় তপনদা বসে আছে। টুপুকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। অফিসের চা জলখাবারের সবটাই তপনদা সামলায়।

টুপুকে দেখে তপনদা বলল, "ম্যাডাম, আপনি এলেন কেন, আমায় ডাকলেই পারতেন।"

টুপু হাসল। পাশে রাখা ওয়াটার ডিসপেন্সার থেকে একটা গ্লাসে করে জল নিয়ে খেল। তারপর বলল, "তপনদা, কোনও বিস্কিট আছে?"

"কেক নেবেন?" তপনদা জিজ্ঞেস করল, "বিস্কিট ভাল নেই।"

"আচ্ছা দিন," টুপু হাত বাড়াল।

কেকটা ভালই। খেয়ে খিদেটা তাও খানিকটা মিটল।

তপনদা জিজ্ঞেস করল, "চা খাবেন ম্যাডাম?"

"নাঃ, পরে। আমি আসি," টুপু মোহিতের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মোহিত ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। ওপরের আলোটা ওর মাথায় পড়ে চকচক করছে। মোহিতের ভুরু দুটো কুঁচকে আছে। চোয়াল শক্ত। দেখে মনে হচ্ছে কিছু সমস্যা হয়েছে।

টুপু দরজা খুলে ভেতরে গেলেও টেবলের কাছে গেল না। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। মোহিত তিন-চার মিনিট চুপ করে নিজের কাজেই ডুবে রইলেন। তারপর যেন খেয়াল করলেন যে, টুপু এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"এসো লাজনি, বোসো," মোহিত ওকে বসতে বলে পাশে রাখা একটা ফাইল তুলে বললেন, "এটা দ্যাখো তো! কিছু কমপ্লেন এসেছে। রিপ্লাই দিয়ো।"

"স্যার, আই নিড আ ফেভার," টুপু সামান্য দ্বিধা নিয়ে বলল।

মোহিত তাকালেন টুপুর দিকে। তারপর বললেন, "মানবের সঙ্গে তুমি ব্রেক আপ করে নিয়েছ? মিঠি আমায় বলল। মানবকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বলল, তুমি নাকি ওকে গালি দিয়েছ? তাই?"

"হ্যাঁ স্যার," টুপু মাথা নিচু করে নিল।

"দ্যাখো, এটা তোমাদের ব্যাপার। আমি এতে ইনভলভ হতে চাই না। তাও যদি পার, তা হলে প্যাচ আপ করে নিয়ো।"

"স্যার, আপনি বললেন বলে বলছি, হি কল্ড মি নেমস। ওর বন্ধুরা ওর সামনে আমায় ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি টাচ করছে দেখেও ও কিছু বলেনি। তারপর রাস্তায় সবার সামনে চিৎকার করে স্ল্যাং বলেছে। আমিও উত্তরে যা বলার বলেছি। আমি স্যার আরও অনেক কিছু বলতে পারি। লাস্ট ওয়ান ইয়ার ইট ওয়জ হেল ফর মি। কিন্তু আমি তো চেষ্টা করেছিলাম। আপনি কষ্ট পাবেন ভেবে..."

"ওয়েট!" মোহিত তাকালেন, "আমি কষ্ট পাব ভেবে! আশ্চর্য! আমায় আগেই বলতে পারতে। যাক গে। দ্যাখো, কী করবে! বাই দ্য ওয়ে কী বলবে বলছিলে!"

টুপু কিছু না বলে ফাইলগুলো এগিয়ে দিল।

মোহিত দেখে সই করে দিলেন সবক'টায়। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আর? আর কী বলবে? ফেভার না কী বলছিলে?"

টুপু ভাবল, আর কী বলা ঠিক হবে! কিন্তু তারপরেই রুনুদির মুখটা মনে পড়ল। মনে পড়ল সাজুর কথাও।

ও বলল, "স্যার, আমার এক দিদি খুব বিপদে পড়েছেন। মানে, খুবই বিপদ। আমার মনে হয় একজনই ওঁকে এর থেকে বের করতে পারবেন।"

"কে?" মোহিত জিজ্ঞেস করলেন।

টুপু সময় নিল একটু, তারপর স্থির গলায় বলল, "আপনি স্যার।"

মোহিত চোয়াল শক্ত করে তাকালেন টুপুর দিকে। সামনে খোলা ল্যাপটপটা বন্ধ করলেন। তারপর হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে। বললেন, "তুমি আমার ছেলেকে গালি দিয়েছ। ওর সঙ্গে ব্রেক আপ করেছ। তার পরেও ফেভার চাইছ! কেন তোমায় হেল্প করব আমি? কী কারণে হেল্প করব?"

টুপু হাসল সামান্য। তারপর কপালের সামনের থেকে চুলটাকে হাত দিয়ে কানের পেছনে নিয়ে গিয়ে বলল, "কারণ, আপনি আপনার ছোটপিসিমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন, তাই।"

(সাতদিন পরে)

ষোলো

আজ সকাল থেকে বাবা আবার অসভ্যতা শুরু করেছে। সাতসকালে মদ গিলে চিৎকার করছে। জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি করছে। একে-ওকে যা তা ভাষায় গালাগালি করছে।

আসলে কয়েকদিন আগে বাবা কয়েকটা লটারির টিকিট কেটেছিল। কোন একজন জ্যোতিষীকে নিজের হাত দেখিয়ে এসেছিল। সে নাকি হাত দেখে বলেছিল যে, বাবার হাতে লটারিতে টাকা পাওয়ার যোগ আছে। কেন বাবা এতদিনেও লটারি কাটেনি! কাটলেই নাকি বাবা মালামাল হয়ে যেত!

আর যায় কোথায়! বাবা সেই জ্যোতিষীর চেম্বার থেকে বেরিয়েই একসঙ্গে পাঁচটা লটারির টিকিট কেটেছিল। আজই ছিল সে সবের ফল ঘোষণার দিন। কিন্তু যা হওয়ার তাই হয়েছে। বাবা এক টাকাও পায়নি। ব্যস, আর যায় কোথায়! বাবা সেই রাগে দুঃখে মদ খুলে বসে পড়েছে। আর শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সবাইকে গালি দিতে শুরু করেছে।

মা আটকাতে গিয়েছিল, কিন্তু পারেনি। বরং মাকে আজ মেরেছে বাবা। ঠেলে ফেলে দিয়েছে। মা কান্নাকাটি করেছে। তারপর আর কিছু না বলে অফিস চলে গিয়েছে।

সারা দিন এসব শুনেছে ইলা। কিন্তু বাবার ঘরে যায়নি। কী হবে গিয়ে! বাবা যে প্রকৃতিস্থ নেই! গেলেই যে এবার ইলাকে আজেবাজে কথা বলতে শুরু করবে। এমনিতেই ইলা আজ খুব টেনশনে আছে। তার মধ্যে যদি এমন সব জিনিস শুনতে হয়, তো ও নিতে পারবে না। দিদি যে এ বাড়ি আসে না, তাতে দিদি বেঁচে গিয়েছে।

এখন সওয়া তিনটে বাজে। ওর মেক আপ আর ড্রেস করা কমপ্লিট। এবার বেরিয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু তাও যেন একটু একটু করে সময় নিচ্ছে ইলা। বুকের মধ্যেটা কেমন করছে! ভয়, কষ্ট, গ্লানি, লজ্জা সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা ফিলিং! আজ বারবার নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই স্কুলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

লাইন দিয়ে ওরা প্রেয়ার করত স্কুলের দেবদারু বীথিতে। জাতীয় সংগীতের পরে হত রবি ঠাকুরের গান। সবার সামনে দাঁড়িয়ে গাইতে হত ইলাকে। কী সুন্দর হাওয়া দিত সকালবেলা! স্কুলের বড় আন্টি ইলাকে খুব ভালবাসতেন। মাকে বলতেন, "দেখবেন, ইলাক্ষী অনেক বড় হবে। নাম করবে।"

আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেন বহুদিন আগে হারিয়ে ফেলা সেই বড় আন্টির মুখটাই মনে পড়ছে বারবার। ও নাকি অনেক বড় হবে! অনেক নাম করবে! তাই কি! নাম করাটাই কি সব? সেইজন্যই কি আজ ওকে দু'জন অচেনা নারীমাংসলোভী পুরুষের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে? তাদের খুশি করতে হবে? নাম করার জন্য এটা কোথায় এসে পড়েছে ও! কোন নরকে পা দিয়েছে!

কিন্তু নরকই-বা কেন? এটা তো একটা বিজনেস! একটা ট্রেড! বার্টার সিস্টেম! ইলা পড়েছে, নানান জায়গায় পড়েছে, মানুষকে বড় হতে গেলে বিখ্যাত হতে গেলে ত্যাগস্বীকার করতে হয়। কম্প্রোমাইজ করতে হয়। সেখানে ও নিজেও না-হয় একটু করল, তাতে ক্ষতি কী! সেক্স নিয়ে আমরা এত বেকার ভাবি কেন! এটা তো একটা শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া মাত্র! এই নিয়ে এতটা সেন্টিমেন্টাল হওয়ার কী মানে!

কিন্তু কিছুই কি মানে নেই? যারা অন্যায়ভাবে ওর শরীরটা ভোগ করে তার বিনিময়ে কিছু দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তারা কি ভাল মানুষ? যারা ভাল তারা তো এসব বিনিময়ের কথা বলে না। তারা হয় সুযোগ করে দিতে পারে, নয়তো পারে না। এর মাঝামাঝি কিছু করতে চায় না। তা হলে যে-লোকগুলো এমন সুবিধে চায়, তারা নোংরা মানসিকতার জেনেও কেন তাদের কাছে মাথা নত করছে ইলা! যে খারাপ, তাদের খারাপ কাজ করার নিরন্তর সুযোগ দিলে তারা তো সেসব করতেই থাকবে! তা হলে!

নাঃ, আর কিছু ভাবতে পারছে না ইলা। আর কিছু ভাববেও না। বিজনকে ও কথা দিয়েছে। সেটার অন্যথা করবে না।

শেষবারের মতো মেকআপটা দেখে নিল ইলা। তারপর মোবাইলটা তুলল। এটা নতুন কিনেছে ও। দেখল, আবার বাদুদা মেসেজ করেছে। লোকটা নাছোড়বান্দা! সেই ডিরেক্টর নাকি ইলাকেই চাইছে রোলটায়। লুক-ওয়াইজ ইলাই নাকি একদম ফিট করবে! আরে বাবা, ওই সব আর্ট টাইপের ফিল্ম করে কী হবে!

ইলার বিরক্ত লাগল। ও মেসেজটা ডিলিট করে ক্যাব বুকিংয়ের অ্যাপটা দেখল। আরে, গাড়ি প্রায় চলে এসেছে! আর সময় নষ্ট করা যাবে না।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে ইলা বাইরের ঘরে এল। বাবার চিৎকার শুনল। শুনল বাবা বলছে, "সব ক'টা শুয়োরের বাচ্চা। আমার পেছনে দিয়ে কী ভেবেছে, পার পেয়ে যাবে? আমিও দেখে নেব। সব শুয়োরের বাচ্চাগুলো চক্রান্ত করছে! ধান্দাবাজিতে ভরে গিয়েছে সব! অন্যের একটু ভাল দেখলেই সব জ্বলতে থাকে। কী করে তার পেছনে দেবে সেই ধান্দা করতে থাকে সব হারামিগুলো! ঢ্যামনামো বের করে দেব সবার।"

ইয়েল লক টেনে দরজা বন্ধ করতে করতেও বাবাকে আরও নানান কথা বলতে শুনল ইলা। ও দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রাস্তায়।

সাদা হ্যাচব্যাক গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ও নাম্বার মিলিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে।

"আলিপুর তো ম্যাডাম?" ড্রাইভার লোকটি মধ্যবয়স্ক। কাঁচাপাকা চুল। আয়নার মধ্য দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল ইলা। তারপর ও চোখ বন্ধ করে পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসল। আর মনে পড়ে গেল গতকাল করা বিজনের ফোনটা।

রাতে খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে এসে বসেছিল ইলা। তখনই ফোনটা এসেছিল।

এত রাতে বিজন ফোন করে না। তা হলে এখন কেন করল?

"স্যার বলুন," ফোনটা ধরেছিল ইলা।

"সরি, অনেক রাতে ফোন করলাম," বিজন স্বভাবগত ভদ্রতায় বলেছিল, "কিন্তু উপায় নেই। তোমাকে যে-দু'জনের আসার কথা বলেছিলাম, কাল আসছেন তাঁরা। আমার আলিপুরের ফ্ল্যাটেই আসবেন। তুমি সাড়ে চারটের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। সুমি থাকবে শুধু। ও সব জানে। সো ডোন্ট ওয়ারি। তুমি শুধু গেস্টদের

এন্টারটেন কোরো। ওঁরা যেন কোনও কমপ্লেন না করেন দেখো। তুমি এই কাজটা করে দাও আমি বাকিটা করে দেব। তোমায় আমি এখনই তোমার ইমেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি কনট্র্যাক্টের কপি। তুমি যেমন ফার্স্ট হিরোইন হতে চেয়েছ সেরকমই হবে। তুমি তোমার কথা রাখবে আমিও আমার কথা রাখব। কেমন?"

কালকে! মানে ওকে কালকেই যেতে হবে? হাত-পা নিমেষে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল ইলার। টেনশনে শুকিয়ে গিয়েছিল জিভ, গলা। অজানা একটা ভয় চেপে ধরেছিল ওকে।

"কী হল শুনতে পাচ্ছ না?" বিজন একটু জোরের সঙ্গে বলেছিল।

"হ্যাঁ স্যার," কোনওমতে উত্তর দিয়েছিল ইলা।

বিজন বলেছিল, "তোমার দ্বিধা আছে মনে হচ্ছে! দ্যাখো, দ্বিধা থাকলে ছেড়ে দাও। অসুবিধে নেই। আমি অন্য ব্যবস্থা করে নেব। তুমিও অন্য ব্যবস্থা করে নিয়ো। নো হার্ড ফিলিংস।"

"যাব স্যার। অসুবিধে নেই। আসলে ফার্স্ট টাইম তো। তাই..." আর কী বলবে বুঝতে পারেনি ইলা।

বিজন হেসেছিল। ভরসা দেওয়ার গলায় বলেছিল, "আরে সবারই একদিন প্রথমবার থাকে। এই নিয়ে এত ভাবলে হয়! বি আ ব্রেভ গার্ল। জাস্ট কয়েক ঘণ্টা, তারপর ভাবো, কোন হাইটে তুমি রিচ করবে! ফিল্মের হিরোইন। পেপারে ছবি। সারা শহর জুড়ে পোস্টার! ইউ উইল বি ফেমাস! ডোন্ট গেট কোল্ড ফিট।"

ইলা হেসেছিল। মনে হচ্ছিল কাল ওর অলিম্পিকের কোনও কম্পিটিশন আর সেই ব্যাপারে ওর কোচ ওকে পেপ টক দিচ্ছে!

ইলা বলেছিল, "আমি চলে যাব স্যার। ডোন্ট ওয়ারি।"

বিজন হেসে বলেছিল, "তুমিও চিন্তা কোরো না। যারা আসবে তারা অ্যাবাভ ফিফটি ফাইভ। খাঁই বেশি কিন্তু খোরাক কম। সব সো-কলড রেপুটেড ফ্যামিলির মানুষ। তোমার আইডেন্টিটি সেফ থাকবে। কেমন? নাউ গেট আ গুড নাইট স্লিপ। কাল আবার ডার্ক সার্কেল নিয়ে হাজির হোয়ো না। বাই।"

গাড়িটা একটা সিগনালে দাঁড়িয়ে আছে। ইলা ব্যাগ থেকে আয়না বের করে নিজেকে দেখল। হ্যাঁ, ডার্ক সার্কেল হয়েছে বই কী। তাও মেক আপ করে যতটা পেরেছে নিজেকে ঠিক করেছে ও।

রাসবিহারীর এই সিগনালটা কী যে বড়! সবুজ হতেই চায় না! এমনিতেই টেনশন হচ্ছে ওর। আর সেখানে গাড়িটাও ঢিকিরঢিকির করে যাচ্ছে।

ও পাশে তাকাল। দেখল, ধুলোমলিন জামাকাপড় পরা তিন-চারটে বাচ্চা দুটো বেলুন নিয়ে খেলছে। আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

চারদিকে ঝাঁপিয়ে পড়া ট্র্যাফিক। চিৎকার। হর্ন। সব কিছুর মাঝেও বাচ্চাগুলো নির্বিকার। আর কী খুশি! অবাক হয়ে গেল ইলা। ওরা কোথা থেকে এত আনন্দ পায়! ওদের তো কিছুই নেই, তাও এত হাসি আসে কোথা থেকে! ওই যে বেলুন নিয়ে ওরা ছুড়ে দিচ্ছে, আবার লুফে নিচ্ছে। এতেই এত আনন্দ! সামান্যতেই এত আনন্দ হয় জীবনে! আর সেখানে ওর তো এত কিছু আছে! তাও এমন নেই নেই লাগে কেন! কীসের জন্য এত চাহিদা? সফল হওয়ার জন্য? কিন্তু এভাবে নাম করা কি আসলে সাফল্য! নিজের কাছে কি আজকের পর থেকে ও শুদ্ধ মনে থাকতে পারবে? যাদের এ-যাবৎ কাল সমালোচনা করে এসেছিল, তাদের মতোই তো হয়ে যাবে ও! নিজেকে কি ঘেন্না লাগবে না! যে-বাবাকে ও অপছন্দ করে, সেও তো ওর চেয়ে মরালি ওপরেই থাকবে।

হাতের তালু আবার ঘামছে ইলার। কেমন একটা করছে শরীর। বমি পাচ্ছে। বাড়ি ফিরে যাবে কি? কিন্তু তা কী করে সম্ভব! এখন যদি ফিরে যায়, তা হলে কেরিয়ার সারা জীবনের মতো গুটিয়ে তাকে তুলে রাখতে হবে। এই ক'দিনে একটা জিনিস বুঝেছে যে, বিজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। ওকে কিছুতেই চটানো যাবে না। ও চটে গেলে অনেক দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

আর অন্যদিক থেকে দেখলে তো বিজনকেও পুরো দোষ দেওয়া যাবে না। ও নিজেই তো গিয়েছিল ফার্স্ট হিরোইন হবে বলে। নিজেই অফার করেছিল অতিরিক্ত কিছু। সেটাই ব্যবহার করছে বিজন। জোর তো করেনি! এখন পিছিয়ে যাওয়া মানে নিজের ক্রেডিবিলিটি হারানো।

বাড়িটা আগেই চিনত ইলা। তাই গাড়িকে ডাইরেকশন দিয়ে ঠিকমতো নিয়ে যেতে অসুবিধে হল না।

গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে ঘড়ি দেখল ইলা। চারটে বাজে। সাড়ে চারটে-পাঁচটা নাগাদ আসবে ওরা। হাত কাঁপছে ইলার। কিন্তু নিজেকে স্টেডি রাখতেই হবে।

ইলা ব্যাগ থেকে একটা চুইংগাম বের করে মুখে দিল। তারপর ঢুকে গেল বড় বাড়িটার গেট দিয়ে।

ইলা লিফট নিল আজ। ছোট্ট লিফট। কিন্তু সুন্দর। ভেতরে গুনগুন করে ফ্যান চলছে। তাও ঘামছে ইলা।

মসৃণভাবে ওকে নিয়ে উঠে গেল লিফটটা। দরজা খুলে বেরিয়ে ও করিডোরে দাঁড়াল। ওই যে ফ্ল্যাট। ও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। নিজেকে কিছুতেই যেন স্টেডি করতে পারছে না। হাত-পা কাঁপছে। বুকের মধ্যে হাজার হাজার ঘোড়া দৌড়চ্ছে।

বেল বাজিয়ে দরজা থেকে সামান্য সরে দাঁড়াল ইলা।

ওইদিকে পায়ের আওয়াজ শুনল। সামনে দরজার আই হোল। সেখানেও ছায়া পড়ল। ইলা বুঝল সুমি দেখছে ওকে।

এবার দরজা খুলে দিল সুমি। ইলা হাসল ওকে দেখে। সুমির মুখে সামান্য বিরক্তি।

সুমি ঘড়ি দেখে বলল, "আর-একটু আগে আসবে তো! জার্নি করে এসেছ। ঘেমেছ নিশ্চয়ই! ইউ মাস্ট কিপ ইয়োরসেলফ ক্লিন। এসো এসো।"

ইলা ঘরে ঢুকে দেখল আজ ফ্ল্যাটটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। সুমি নিজেও সেজে আছে। তবে তীব্র নয় সেই সাজ!

সুমি ওকে দেখল ভাল করে। ইলার কেমন যেন অস্বস্তি হল। কী দেখছে সুমি!

সুমি বলল, "আমি কিছু লঁজারি নিয়ে এসেছি। ভেতরের ঘরে আছে। ওখানে তুমি বসবে গিয়ে। ওঁরা এলে আমি ওদের অন্য ঘরে নিয়ে বসাব। তুমি তারপর চেঞ্জ করে ওদের কাছে যাবে। কেমন? আর হ্যাঁ, প্রাইভেট পার্টস শুড বি ক্লিন। তারও জিনিসপত্র রাখা আছে ঘরে।"

"লঁজারি!" ইলা ঢোঁক গিলল। ওকে আলাদা ঘরে বসাবে! কী সাংঘাতিক!

"হ্যাঁ, আগে শোনোনি?" সুমির গলায় আবার বিরক্তি, "তুমি কি নিজে প্রোটেকশন নিয়ে এসেছ?"

"প্রোটেকশন?" ইলা বুঝতে পারল না।

"কন্ডোম। নিয়ে এসেছ কি?" সুমি জিজ্ঞেস করল।

"না মানে, কন্ডোম... ইয়ে..." ইলা কী বলবে বুঝতে পারল না।

সুমি বলল, “তবে কি তুমি কন্ডোম ছাড়া সেক্স করতে চাও অজানা মানুষের সঙ্গে? আশ্চর্য! আর ইউ ননসেন্স! আমি জানতাম তুমি এমন কিছু করবে! এই নাও, প্যাকেটটা রাখো। ইউজ় করবে এটা। বোকা মেয়ে কোথাকার! এখন চলো ঘরে বসবে।”

ভেতরের ঘরটা ছোট। একটা সিঙ্গল বেড আর দুটো চেয়ার রাখা। তবে এসি আছে।

সুমি ওকে বলল, “এখানে অপেক্ষা করো। আমি ডেকে নেব তোমায়। রিল্যাক্স করো। নিজেকে ক্লিন রাখো। তোমায় কেউ মারবে না, বকবে না। জানবে ম্যাক্সিমাম ছেলেরা আসলে ভেড়া। সেক্সের লোভ দেখিয়ে তাদের দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নেওয়া যায়। দে আর ইডিয়টস। আর যারা আসবে তারা বয়স্ক মানুষ। ইল পারফরমার। ভয় পেয়ো না। মেক দেম হ্যাপি। কেমন? প্লেন একটু লেট আছে। সো টেক রেস্ট।”

সুমি দরজাটা টেনে দিয়ে চলে গেল। চেয়ারে গিয়ে বসল ইলা। ঘরের দেওয়ালে ঘড়িটা টিকটিক করছে। ইলা তাকাল। সওয়া চারটে বাজে।

সময় কাটতে লাগল। ইলা চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় আধশোয়া হল। কাল রাতে ঘুম হয়নি অতিরিক্ত টেনশনে। এমন নিস্তব্ধ চারদিক। তার সঙ্গে এসির ঠান্ডা। শরীর অসাড় লাগছে। কেমন যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে ওর চোখ।

ইলা আচমকা দেখল, ঘরের মধ্যে চারটে বাচ্চা চলে এসেছে। ওরা বেলুন নিয়ে খেলছে নিজেদের মধ্যে। আর খেলতে খেলতে হাসছে। হেসে একদম গড়িয়ে পড়ছে একে অন্যের গায়ে। ওরা ইলার দিকে তাকাচ্ছে। ডাকছে ইলাকে। তারপর নীল ছেঁড়া ফ্রক-পরা মেয়েটা আচমকা বেলুনটা ছুড়ে দিল ইলার দিকে। ইলা ধরতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুম করে ফেটে গেল বেলুনটা। আর ঘুম থেকে জেগে উঠল ইলা। শুনল বেল বাজছে। ওই যে বেল বাজছে বাইরে!

ওরা তবে এসে গেল! ঘড়ি দেখল ইলা। পাঁচটা বেজে পাঁচ! হাত-পা ঠান্ডা হয়ে কেমন যেন কাঁপছে ইলার। না, ও পারবে না। এসব কিছুতেই পারবে না। ভেবেছিল পারবে, কিন্তু না, ওর দ্বারা হবে না এসব। ইলা ভাবল, আর না, ও পালাবে। কিন্তু কী করে? ওই তো এসে গিয়েছে ওরা। ওই তো সুমি আছে ওই ঘরে! তা হলে! এখন কী করবে! ও বুঝতে পারেনি এই ব্যাপারটা এত কঠিন আর কষ্টের। ওর ইচ্ছের বেলুন ফেটে গিয়েছে একদম। আর এভাবে পেতে চায় না কিছু। কিন্তু ওরা কি মানবে? ছেড়ে দেবে?

আবার বেল বাজল। ওই তো দরজা খোলার আওয়াজ! কারা যেন কথাও বলছে। আর পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকে।

ইলার ঘাম হচ্ছে খুব। ও ভয়ে কাঁটা হয়ে তাকিয়ে রইল দরজার দিকে। ওই যে দরজার নব ঘুরল। ঈশ্বর রক্ষা করো।

ইলা দেখল, দরজাটা খুলে গেল ওর সামনে। ওর মনে হল, এটা ঘরের দরজা নয়, এটা যেন নরকের দরজা।

সতেরো

পার্টি অফিসে ঢুকেই কানাইদাকে দেখতে পেল রতিশ। হাতে খইনি ডলতে ডলতে তাকিয়ে আছে টিভির দিকে। টিভিতে একটা ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে। কোনও একটা লিগ। রঙিন জামাকাপড় পরে সবাই হাঁকড়ে হাঁকড়ে বল মারার চেষ্টা করছে। ও গিয়ে বসল কানাইদার পাশের চেয়ারে। হাত বাড়িয়ে প্লাস্টিকের টেবিলের ওপরে হেলমেটটা রাখল।

কানাইদা তাকাল ওর দিকে। বলল, "কী রে, এত দেরি করলি? জিতেশদা তো কখন এসে গিয়েছেন! খোঁজও করছিলেন।"

"আরে, সকালে বাজাজের কাছ থেকে টাকা আনতে গিয়েছিলাম। মালটা টাকা দিতে বহুত টালবাহানা করছিল। বলে কিনা আমায় তো দিয়েছে আবার কেন দেবে! শালা! তারপর বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতে দেরি হল। তা, আজ তো জিতেশদা আসেন না। আজ এলেন যে! তাও এমন সাড়ে তিনটের সময়!" রতিশ একটু অবাকই হল।

কানাইদা বলল, "কে জানে! আচ্ছা শোন না, পপি বলছিল তোর কথা!"

"পপি?" একটু আশ্চর্য হল রতিশ। এই ঘরে বেশ কিছু লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। পার্টি অফিসের বাইরেও বসে রয়েছে কিছু। আর সেটাই স্বাভাবিক। জিতেশদা মন্ত্রী মানুষ। সঙ্গে তো লোক-লস্কর থাকবেই। কিন্তু একটাই বাঁচোয়া, কেউ এইদিকে মন দিচ্ছে না।

কানাইদা হাসল। বলল, "হ্যাঁ রে, বলছিল তুই আসিস না কেন আজকাল!"

"আসলে কাজ থাকে তো!" কোনওমতে কথাটা কাটাতে চাইল রতিশ। পপির সঙ্গে একটা ফিজিক্যাল রিলেশন আছে ওর। সেটা নেহাতই শারীরিক তাড়না। কিন্তু বিনিকে দেখার পর থেকে পপির দিকে মন দিতে ইচ্ছে করে না। ও শত চেষ্টা করেও বিনিকে নিজের মন থেকে সরাতে পারছে না। তাই পপির কাছেও যায় না আর।

কানাইদা আরও সরে এল ওর কাছে। তারপর গলা নামিয়ে বলল, "যাস একটু ওর কাছে। দুপুরে যেমন যেতিস আর কী! আমার চেয়ে কত ছোট জানিস তো! তুই যাস না, বেচারি রেগে থাকে। আমায় নিয়ে টানাটানি করে। আমি কি আর পারি! আমার ওসব ইচ্ছেও করে না। জানিস তো আজকাল আশ্রমে যাই সন্ধেবেলা। কী সুন্দর আরতি হয়! কথকঠাকুর কী সুন্দর গল্প বলেন! আর খোলা চত্বরটা এত সুন্দর না! প্রভু ছাড়ার কথা বলেন, শুনি। ভাল লাগে। সেখানে রাতে ওভাবে কেউ টানাটানি করলে মনখারাপ হয় না? তুই বল!"

রতিশ কী বলবে বুঝতে পারল না। তাকিয়ে রইল কানাইদার দিকে। লোকটা তা হলে সব জানে!

কানাইদা যেন ওর মনের কথাই পড়তে পারল। হাসল একটু। বলল, "তোরা ইয়ং। তোদের রক্ত গরম। তখনই পপির বাড়ির লোকেদের বলেছিলাম যে, আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু শুনল না।

তুই একটু দেখিস না! মানে, ওসব তো জীবনেরই অঙ্গ, বল? ওসব না হলে শরীর খারাপ তো হবেই, তাই না?"

রতিশ কী বলবে বুঝতে পারল না। এতদিন ভাবত কানাইদা বোকাসোকা মানুষ। কিছু জানে না, বোঝে না। কিন্তু এখন তো দেখছে সবই জানে!

কানাইদা হেসে পিঠে হাত রাখল ওর। বলল, "সিগারেট দিবি? সেদিন যেটা দিয়েছিলিস না, দারুণ ছিল সেটা।"

রতিশ পকেট থেকে বের করে গোটা প্যাকেটটাই দিয়ে দিল।

কানাইদা হেসে দুটো বের করল সেখান থেকে। তারপর বাকি প্যাকেটটা আবার ওর পকেটেই গুঁজে দিল। বলল, "প্রভু বলেন, বেশি লোভ করতে নেই। আস্তে আস্তে এটাও ছেড়ে দেব। ছাড়ার মধ্যেই আনন্দ রে! ধরে থাকতে গেলে কত কষ্ট! এই বুঝি চলে গেল— সারাক্ষণ এমন ভয়। আরও কত কী! তাই প্রভু বলেন ছাড়তে হবে। ত্যাগ করতে হবে।"

কানাইদা হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু তার আগেই সামনের দরজাটা খুলে গেল। একটা রোগা লোক বেরিয়ে এল। লোকটাকে চেনে রতিশ। জিতেশদার সেক্রেটারি। হরি সমাদ্দার।

রতিশের দিকে তাকিয়ে হরি বলল, "আরে, তুমি বসে আছো? স্যার জিজ্ঞেস করছেন তোমার কথা। এসো ভেতরে। তোমার সঙ্গে কথা বলেই স্যার বেরবেন।"

রতিশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কানাইদা আজ পুরো শুইয়ে দিয়েছে ওকে। পপির সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে জেনেও লোকটা কী ঠান্ডা মাথায় এতগুলো কথা বলল! লোকটা হয় সাধু, নয় পাগল, আর নয়তো বিশাল বড় কোনও শয়তান! ভয় লাগছে ওর কানাইদাকে দেখে। আর পপিও কেমন মেয়ে রে বাবা! সব বলে দিয়েছে! কীসব হচ্ছে চারদিকে! কারও ওপরই বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না।

রতিশ উঠে জামার বুকের কাছের বোতামটা বন্ধ করল। তারপর হাত দিয়ে জামাটা ঠিক করে জিতেশের ঘরের দিকে এগোল।

ঘরের ভেতরে পা দিয়েই কেমন যেন শরীর শক্ত হয়ে গেল জিতেশের। আরে, ঘরে সেই সাজু বলে লোকটাও বসে রয়েছে! লোকটা এই অবধি এল কী করে? জিতেশদা খুব রাশভারী আর ব্যস্ত মানুষ। কাউকেই বিশেষ পাত্তা দেয় না। তার কাছে পৌঁছনো খুব একটা সহজ নয়। সেখানে লোকটা সামনে এভাবে বসে আছে! কেন!

"নমস্কার দাদা!" রতিশ জোড় হাত করে সামান্য হেসে মাথা ঝোঁকাল।

"তুই কী শুরু করেছিস রতিশ?" জিতেশদা কোনওরকম ভূমিকা না করেই বলল কথাটা।

"কী করেছি দাদা?"

"ন্যাকা সাজা হচ্ছে জানোয়ার! জুতিয়ে তোমার বদন বিগড়ে দেব। আমাদের পার্টি কি গুন্ডা পার্টি নাকি? যেখানে সেখানে তুই গুন্ডাগিরি করে বেড়াবি? কেউ তোকে কিছু বলবে না? জনিকে টুর্নামেন্ট করতে না দিয়ে সেই মাঠে মেলা বসিয়েছিস কেন? বাজাজের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। তার কাছে আজ সকালে গিয়ে জোর করে আরও পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে এসেছিস কেন? কলেজের সামনে একটা মেয়েকে আক্রমণ করেছিস কেন? সেখানে একটা ছেলেকে মেরে নাক-মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিস? আবার ইউনিয়নের ছেলেদের দিয়ে ওদের

হ্যারাস করছিস! আর লেক গার্ডেন্সের একটা ফ্ল্যাট অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছিস কেন? কীসের জন্য? কলকাতা শহরটাকে তোর বাপ তোকে লিখে দিয়েছে? আমাদের পার্টির কোনও মানসম্মান নেই? গুন্ডামি করার জায়গা এটা? লাথি মেরে বের করে দেব পার্টি থেকে।"

রতিশ থতমত খেয়ে গেল। জিতেশদাকে এমন রেগে যেতে দেখেনি কোনওদিন!

"না জিতেশদা, আমি... মানে... ব্যাপারটা তা নয়!"

"বাচ্চা মেয়েদের পেছনে লাগা! চামড়া খুলে নেব শুয়োরের বাচ্চা! ফ্ল্যাটের চাবিটা কই? কোথায় চাবি?"

রতিশের পা কাঁপছে। জিতেশদার এমন মূর্তি ও দেখেনি কোনওদিন। ভয়ে ভয়ে বের করে দিল চাবিটা।

জিতেশ সাজুকে দেখিয়ে বলল, "ওঁর হাতে দে। আজকের পর থেকে আর ওই ফ্ল্যাটের ধারেপাশে যাবি না। তোর যা মাল আছে কাল হরি গিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের করে তোর বাড়িতে রেখে আসবে। আর যদি কোনওদিন শুনেছি, কোনওভাবে তুই ওদের থ্রেট করেছিস বা ওদের কোনও ক্ষতি হয়েছে, তা হলে জানবি তোর ছাল ছাড়িয়ে নেব আমি। মস্তানি করার জায়গা এটা? পার্টির নাম খারাপ করবে তোমরা? জানোয়ার!"

রতিশ চাবিটা সাজুর সামনে রাখল।

"সরি বল," জিতেশ চোয়াল শক্ত করল।

"কী!" রতিশ ঘাবড়ে গেল।

"কানে কথা যাচ্ছে না? সরযুকে সরি বল। হাতজোড় করে সরি বল। না-বললে এখানেই নাকখত দেওয়াব তোকে। বল সরি।"

"সরি, সরি দাদা। ভুল হয়ে গিয়েছে। আপনি আমাকে বললেই পারতেন। এখানে শুধু শুধু..."

"তুই আবার কথা বলছিস, শুয়োর!" জিতেশ টেবিলে রাখা স্টেপলারটা তুলে আচমকা ছুড়ে মারল ওর দিকে। একটুর জন্য সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

"সরি জিতেশদা, সরি," রতিশ ভয় পেল।

জিতেশ বলল, "দু'বছর আগে টালিগঞ্জ রোডে জনির একটা ছেলেকে মার্ডার করিয়েছিলিস। মনে আছে তো? আমি চেপে রেখেছি ব্যাপারটা। আজ বললে কিন্তু আজই ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে। ভাল করে থাকবি, কাউন্সিলরের টিকিট পাবি। এদিক-ওদিক করলে লাথি মেরে বের করে দেব। বুঝেছিস?"

রতিশ মাথা নামিয়ে নিল। আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল? এমন হেনস্থা বাপের জন্মেও হয়নি।

জিতেশ বলল, "শোন, যা বললাম মনে রাখবি। ওই ফ্ল্যাটের ধারেপাশে যাবি না। এদের কোনও ক্ষতি হলে তুই রেসপনসিবল থাকবি। মনে থাকে যেন!"

রতিশ মাথা নাড়ল, "আমি তবে আসি?"

"তোকে যেতে বলেছি আমি?" জিতেশ চোয়াল শক্ত করল, "এখনই কলেজে যাবি। ওখানে ওই মেয়েটা, মানে বিনি আছে। ওই ছেলেটাও আছে। সবার সামনে ওদের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে নিবি। আমাকে ফোন করবি ওখান থেকে। জানাবি যে মিটিয়েছিস।"

"জিতেশদা এটা কী বলছেন! কত জুনিয়র থাকবে! সেখানে... আমি..."

"তুই কে রে? পাতি একটা গুন্ডা। আজ লাথ মেরে বের করে দিলে জুতো সেলাই করেও খেতে পারবি না। কারণ জানিস? কারণ, ওটাতেও শিক্ষা লাগে, স্কিল লাগে, পরিশ্রম লাগে! মুফতখোর তোরা। মদ খেয়ে

ভুঁড়ি আর গ্যাস খেয়ে ইগো বাড়িয়েছিস। কোনও যোগ্যতা আছে তোদের? ওই যে অত লাখ টাকার বাইক চড়ছিস সেটাও তো তোলার টাকায়। নিজের যোগ্যতায় কামাতে হলে সাইকেল কিনতে পারতিস? যা বলছি করবি রতিশ। এমনিতেই তোকে আমি প্রোটেক্ট করি বলে পার্টিতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয় আমায়। আমি হাত তুলে নিলে তুই কিন্তু কেউ নোস, জানিস তো?"

রতিশ বলল, "আমি যাচ্ছি দাদা।"

"দাদাগিরি করবি না কিন্তু। আমায় জানাবি। যা," জিতেশ মাছি তাড়ানোর মতো করে হাত নাড়াল।

রতিশ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আর কোনওদিকে তাকাল না। সোজা পার্টি অফিসের বাইরে বেরিয়ে এল।

জিতেশের ঘরটা কাচ আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা। কিন্তু এমন করে চিৎকার করে কথা বলেছে যে, বাইরের লোকজন নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে। মাথা গরম হয়ে আছে রতিশের। মনে হচ্ছে হাতের কাছে কাউকে পেলে মেরেই দেবে। কিন্তু উপায় নেই। সব অপমান এখন হজম করে রাখতে হবে।

রতিশ ভাবল, শালা জিতেশ বারিক! তুমি কি সারা জীবন চেয়ারে থাকবে! থাকবে না। তখন তোমায় দেখে নেব। আর সাজু! তোমায় তো আমিই রাস্তায় ফেলে কুকুরের মতো মারব। মারবই। সবার সময় আসে। আমারও আসবে। তখন দেখব কে কত বড় বাপের ব্যাটা! আজ যে এইভাবে অপমান করা হল, এটা আমি ভুলব না। আর বিনিকেও ভুলব না। ওই মেয়েকে আমি তুলেই ছাড়ব। তাতে পার্টি থাকলে থাকবে, গেলে যাবে!

পকেট থেকে বাইকের চাবি বের করে বাইকে চড়ে বসল রতিশ। আজ কলেজে গিয়ে সব মিটিয়ে নেওয়ার ভান করবে। কিন্তু কাউকে ছাড়বে না ও। কাউকেই না।

বাইক নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় রিয়ার ভিউ মিররে দেখল, কানাইদা এসে পার্টি অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শহরের রাস্তা দিয়ে হু হু করে বাইক চালাল আজ রতিশ। মাথা এত খারাপ হয়ে আছে যে, হেলমেটটা আনতে ভুলে গিয়েছে একদম। থাক হেলমেট। ওর বাইকে পার্টির ফ্ল্যাগ লাগানো আছে। দেখলে কেউ কিছু বলবে না।

ও ঠিক করে নিয়েছে, কলেজে গিয়ে ছেলেটাকে ডেকে আনবে ইউনিয়ন রুমে। তারপর সেখানে যা বলার বলে নেবে। ক্ষমা তো চাইবে না। কিন্তু ছেলেটাকে চাপ দিয়ে জিতেশদাকে ফোনে বলিয়ে নেবে যে, সব ঠিক আছে।

তারপর সময় বুঝে ছেলেটাকে মেপে নেবে।

কলেজের সামনে গিয়ে বাইকটা দাঁড় করাল রতিশ। বাইকটাই এমন যে সবাই ঘুরে তাকায়। ও বাইক থেকে নেমে জামার ওপরের দুটো বোতাম খুলে নিল। এখানে সবাই চেনে ওকে। সমঝে চলে। সেটাই মেনটেন করতে হয়। ও ঘড়ি দেখল। পৌনে চারটে বাজে। এখানে কাজ মিটিয়ে আজ একবার রমলার কাছে যাবে। মাথা এমন হয়ে আছে যে, ঠান্ডা করতে হবে নিজেকে।

কলেজের ভেতরে যেতে হল না রতিশকে। চিত্ত বলে সেই ছেলেটাকে বাইরেই দেখল ও। পাশে বিনি রয়েছে। দু'জনেই কোনও একটা বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড হাসছে।

গোটা ব্যাপারটা দেখে মাথাটা যেন আরও গরম হয়ে গেল রতিশের। কলেজে কী করতে আসে বিনি? পড়াশোনা করতে, না এসব আড্ডা আর ফাজলামো করতে!

রতিশ এগিয়ে গেল ওদের দিকে। তারপর কাছে গিয়ে পেছন থেকে চিত্তর হাত ধরে বলল, "এই, এদিকে শোনো!"

চিত্ত চমকে গেল একটু। ঘুরল। আর ঘুরে যেই দেখল রতিশকে, অমনি কী যেন হল ছেলেটার, ও আচমকা রতিশের মুখ লক্ষ করে ঘুষি চালিয়ে দিল।

রতিশ এটার জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না। ঘুষিটা আচমকা বলেই লাগল খুব। ওর মনে হল চোয়ালটা বোধ হয় ভেঙেই গেল। ছেলেটার গায়ে জোর আছে তো! রতিশ পড়ে গেল মাটিতে। মাথার পেছনটা ঢিপ করে লাগল কলেজের দেওয়ালে। চোখে যেন সরষেফুল দেখল রতিশ।

ও মাটিতে পড়ে গিয়ে শুনল চিত্ত বলছে, "ভাগ বিনি।"

মাথা ঝেড়ে উঠতে সামান্য সময় লাগল রতিশের। দেখল, বিনিকে পেছনে বসিয়ে চিত্ত বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল!

শুয়োরের বাচ্চা আমায় মারল! সবার সামনে আমায় মেরে মাটিতে ফেলে দিল! আজ ওকে মেরেই ফেলে দেব আমি। রতিশের মাথা থেকে জিতেশ বারিক-টারিক মুছে গেল নিমেষে। মনে হল আজ এসপার নয় ওসপার করেই ছাড়বে ও।

উঠে দাঁড়িয়ে নিজের টাল সামলাল রতিশ। তারপর দৌড়ে গিয়ে বাইকে উঠে স্টার্ট করল। ওকে মেরে পালানো হচ্ছে বিনিকে নিয়ে! আজ যেখানেই পালাক না কেন ওই চিত্ত, ওকে ধাওয়া করে ধরবেই! তারপর দেখে নেবে শুয়োরকে!

গর্জন তুলে বাইক চলছে। ওই দূরে চিত্তদের বাইকটাকে দেখা যাচ্ছে। চিত্তর বাইকটাও বিদেশি স্পোর্টস বাইক। হরিণের মতো ছুটছে। যাদবপুর থানার সামনে থেকে অভিষিক্তা হয়ে বাইপাসে গিয়ে উঠল রতিশ। রোখ চেপে গিয়েছে ওর। আজ তো ছাড়বে না কিছুতেই।

বাইপাস থেকে সায়েন্স সিটির দিকে এগোচ্ছে ছেলেটা। অনেকটা কাছে চলে এসেছে রতিশ। কিন্তু বাইপাসে গাড়ির ঢল। ইচ্ছে হলেও জোরে যেতে পারছে না। তাও রতিশ দাঁতে দাঁত চেপে এগোল। আজ ওই চিত্তর একদিন কি ওর একদিন!

ডিসান মোড়ের কাছে রতিশ দেখল সিগনাল লাল হয়ে আছে। এইবার তো ব্যাটাকে থামতেই হবে। এতক্ষণ ভাগ্য ভাল ছিল বলে সব সবুজ সিগনাল পেয়ে গিয়েছিল।

রতিশ সামনের গাড়িগুলোকে কাটিয়ে আরও কাছে চলে এল। সিগনালের কাছে এসে চিত্তও যেন বুঝতে পারছে না কী করবে! ও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রতিশকে। তারপর আচমকা বাঁ দিকে টার্ন করে বোসপুকুরের রাস্তায় ঢুকে গেল। এই সিগনালটাও ছাড়ল একই সময়ে। রতিশ আরও জোরে এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে টার্ন নিল। এই রাস্তায় এখন লাল সিগনাল। কিন্তু চিত্ত মানল না। সোজা চালিয়ে দিল গাড়ি। রাস্তা ফাঁকা। এবার বাছাধন যাবে কোথায়! রতিশও চালাল জোরে।

আর তখনই দেখল একটা বয়স্ক লোক। পা নেই। একটা চাকা লাগানো পিঁড়ির মতো জিনিসে বসে শান্ত মনে হাত দিয়ে টেনে টেনে রাস্তা পার করছে। চিত্ত খুব সহজে কাটিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটাকে। কিন্তু রতিশ

পারল না। ওর গাড়ি বড় আর ভারী। আর লোকটা একদম কাছে চলে এসেছে আচমকা। ও লোকটাকে কাটাতে প্রাণপণে ডান দিকে হ্যান্ডেল ঘোরাল আর গাড়িটা বুলেটের মতো ছিটকে গেল ডিভাইডারের দিকে। শেষমুহূর্তে ব্রেক কষেছিল রতিশ, কিন্তু সামলাতে পারল না।

বাইকটা লাফিয়ে উঠে ডিভাইডারে দাঁড়ানো একটা লোকের বুকের মধ্যে ধাক্কা মারল। আর রতিশ নিজেও উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তার পাশের একটা লোহার রেলিংয়ের ওপর।

রতিশের মনে হল মাথার মধ্যে পরমাণু বোমা ফেটেছে! পৃথিবী নিমেষে নিভে এল ওর সামনে। অন্ধকার, চারদিকে শুধু অন্ধকার! আর একটা অতল খাদ! তার মধ্যে সারা জীবনের মতো তলিয়ে যেতে যেতে রতিশ যেন আজ আবার শুনতে পেল সকালে স্নান সেরে বাবা স্তোত্র পাঠ করছে কলতলায়। আজ হাওয়া দিচ্ছে খুব! ওদের উঠোনে উড়ে এসে পড়ছে কত হলুদ রাধাচূড়া! মা ডাকছে ওকে। ঘুম থেকে উঠতে ডাকছে। ওর প্রিয় রুটি আর আলুভাজা তৈরি যে!

মা, ও মা, তুমি কি জানো, এই ঘুম কারও ডাকে ভাঙে না। এই ঘুম চিরস্থায়ী। একাকী যাত্রার সঙ্গী! অন্য কোনও জীবনে, অন্য কোনও ভাল মানুষ হয়ে না-হয় তোমার কাছে ফিরে আসব আবার! ততদিন একাই চলতে হবে! একদম একা!

অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল রতিশ।

আঠারো

“ক’টা বাজে দাদা?” পাশ থেকে প্রশ্নটা এল।

লোকটার দিকে তাকাল নমন। বয়স্ক লোক। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গালে কয়েকদিনের না-কামানো দাড়ি। গায়ে ধূসর জামা। দেখেই বুঝল লোকটা ট্যাক্সিচালক।

নমন পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল। তারপর বোতাম টিপে আলো জ্বালিয়ে দেখল। বলল, “চারটে তেইশ দাদা।”

লোকটা মাথা নাড়ল। বলল, “বাজার খুব খারাপ। ভাড়াই পাচ্ছি না। যাবেন নাকি কোথাও? মিটারেই যাব।”

নমন হেসে মাথা নাড়ল।

লোকটাও হাসল। বিষণ্ণ হাসি। তারপর একটু সামনে রাখা বড় হলুদ রঙের ট্যাক্সিতে উঠে হালকাভাবে গান চালাল একটা। মহম্মদ রফি ছড়িয়ে পড়ল বিকেলের এই জটপাকানো জায়গার হাওয়ায়।

হাতের সুটকেসটা বেশ ভারী। পঁচিশ লাখ টাকা যে এত ভারী হয় জানত না নমন। এটাকে হাতে করে ধরে দাঁড়াতে রীতিমতো ভয় লাগছে। কিন্তু কী করবে? বিজন বলেছে। ও তো আর না করতে পারে না।

বাবুর এখানেই আপত্তি। বাবু বলে, “শালা, তুই ক্রীতদাস। নিজের কাজ কিছু করতে পারলি না? এসব কাজে কেউ ঢোকে? কোনও সময়-টময় নেই। বললেই লেজ তুলে দৌড়ও! তোর মালিক কি নীলকর সাহেব নাকি রে? মালটা কোন টিমের সাপোর্টার রে? একদিন ক্লাবে নিয়ে আসিস তো সাইজ করে দেব!”

বাবুটা পাগল। সব কথায় ফুটবল আর ক্লাব নিয়ে আসে। আরে বাবা, বিজন কোন ক্লাবের সাপোর্টার সেটা ও জানবে কী করে!

আসলে আজ মাকে নিয়ে কয়েকটা টেস্ট করানোর ছিল। বাবু, মিনু আর সরলামাসি গিয়েছিল নমনের সঙ্গে। বিজনের কাছ থেকে ছুটি নিয়েই গিয়েছিল। কিন্তু তিনটে নাগাদ আচমকা বিজন ফোন করে বলে যে, ওই ডিসান মোড়ের কাছে আসতে হবে। আজ গাড়ি নেই ওর সঙ্গে। খুব দরকার। এখুনি যেন আসে।

নমন আর কী করবে! অসহায়ভাবে তাকিয়েছিল মিনুর দিকে।

মিনু বলেছিল, “তুমি যাও নমনদা। আমরা তো আছি। চিন্তা কোরো না। টেস্ট করিয়ে কাকিমাকে নিয়ে বাড়ি চলে যাব। তুমি মাথা ঠান্ডা করে যাও।”

বাবু বসেছিল পাশেই। বলেছিল, “শালা, তুই ক্রীতদাস...”

চারটে নাগাদ এখানে এসে পৌঁছেছে নমন। এসে দেখেছিল সামান্য বিরক্তমুখে বাইরে এই সুটকেসটা নিয়ে অপেক্ষা করছে বিজন।

ওকে দেখে বিজন বলেছিল, “যাক, এসে গেছ! শোনো, এই সুটকেসটা নিয়ে এখানে একটু দাঁড়াও। আজ ভানুও নেই। এতে পঁচিশ লাখ টাকা আছে। ক্যাশ। সঙ্গে একটা রিভলভার। এটা ধরে দাঁড়াও। আমার ওই

পাড়ে একটু কাজ আছে। সেরে আসছি। ফিরে এলে একসঙ্গে যাব। আলিপুরে আজ তোমার বান্ধবীর পরীক্ষা। এই টাকাটা পৌঁছে দিয়ে, সেখানে যাব।"

"বান্ধবীর পরীক্ষা? মানে?" নমন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

বিজন হেসে বলেছিল, "তুমি ছাগল একটা, জানো তো? তোমাকে যে মেয়েটা ইউজ় করেছে সেটা বোঝো?"

নমন কী বলবে বুঝতে পারেনি।

বিজন চোয়াল শক্ত করে বলেছিল, "তুমি সত্যি বোকা, নাকি বোকা সেজে থাকো? জানো, ও এসেছিল আমার কাছে সেক্সুয়াল ফেভারের বদলে কাজ চাইতে!"

নমন বুঝতে পারছিল না, কেন ওকে এসব বলছে বিজন।

বিজন বলেছিল, "আমার ওসবের দরকার নেই। কিন্তু অন্যদের আছে। তাদের আজ আলিপুরের ফ্ল্যাটে এন্টারটেন করবে তোমার বান্ধবী। বুঝেছ? এই টাকাটা এক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে সেখানে যাব আমরা। আর খেলা দেখব। তুমিও দেখবে। ইলাক্ষী জানে না কোন খেলায় ও ঢুকেছে! জানে না ওকে আমি কোথায় কোথায় কীভাবে ইউজ় করব! লোককে ইউজ় করতে গেলে কী হয় ও বুঝবে!"

"স্যার..." নমন অসহায়ভাবে তাকিয়েছিল বিজনের দিকে।

"আর ক্যালানেপনা নয়। ধরে থাকো এই সুটকেস। তোমার বান্ধবীর ক্লায়েন্টদের প্লেন লেট আছে। ফলে টাইম আছে আমাদের।"

নমনের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, "স্যার, এতগুলো টাকা! এভাবে একা! আমি!"

"তো? কেউ তো জানে না কী আছে এতে! এটা আমার পারসোনাল কাজ। একজনের টাকা অন্যজনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমার বউকেও আমি জানাই না এসব ব্যাপারে। স্টপ বিয়িং আ কাওয়ার্ড। গ্রো আ পেয়ার অ্যান্ড স্ট্যান্ড হিয়ার। একদম ম্যাদামারা হয়ে থাকবে না। তোমাকে আমি ঠিক মানুষ করে ছাড়ব," বিজন ওকে একরকম ধমক দিয়ে ওই পাড়ে গিয়েছে।

মনটা খারাপ হয়ে আছে। আসলে আমরা জীবনের সত্যগুলো নিজেরা জানি আর বুঝিও। আর সেগুলোকে নিজের মতো করে ম্যানেজ করার চেষ্টাও করি। কিন্তু সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে যদি অন্যরা আমাদের মুখের ওপর কথা বলে দেয়, তা হলে খুব কষ্ট হয়। এই এখন যেমন হচ্ছে নমনের।

বিজন লোকটা এত খারাপ! মানুষের সুযোগ নিচ্ছে আবার বুক বাজিয়ে বলছেও? এমন লোকের কাছে কাজ করে ও! ও কি এতটাই অক্ষম হয়ে গিয়েছে! নিজের ওপর ঘেন্না লাগছে নমনের। মনে হচ্ছে এক্ষুনি কাজ ছেড়ে দেয়। জীবন ওকে কোথায় নামিয়ে আনল!

আর ইলা এসব করছে! শেষে এইসব! কী হবে এমনভাবে নাম করে! কেউ যদি না চেনে তাতে কী এল গেল! একটা জীবনে, মনের শান্তি নিয়ে থাকাটাই তো আসল। তার বাইরে সবই তো বাড়তি, অতিরিক্ত। সেখানে নাম করতে হবে বলে এইসব করতে হবে! আর এইসব করলেই যে নাম হবে তারও তো নিশ্চয়তা নেই। আর নিশ্চয়তা থাকলেও কি এভাবে করতে হবে! একটা ন্যূনতম বিবেক বলে কিছু থাকবে না! আচ্ছা, ওকে না-হয় ইউজ় করল। ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে এইসব! বিজনের থেকে এসব শুনতে হচ্ছে!

আচমকা কষ্ট হল নমনের। না, প্রেম বা সেই সংক্রান্ত ইনসিকিওরিটি-জনিত কষ্ট নয়। বরং মানুষের জন্য আর-একটা মানুষের কষ্ট। ওর মনে হল, কোনও উপায় থাকলে ও ঠিক ইলাকে ওই জায়গা থেকে এখনই গিয়ে বের করে আনত। কেন জানে না, কিন্তু ওর মনে হচ্ছে ইলা ঝোঁকের মাথায় বললেও আসলে ও মন থেকে এসব করতে চায় না। ও নিশ্চয়ই কষ্টে আছে।

ইলাকে কি একটা ফোন করবে? কিন্তু ইলা তো ফোন করে না ওকে। আর ও নিজে ফোন করে দেখেছে, একবার রিং হয়েই কেটে যায়। নমন বোঝে যে, ওকে ব্লক করে রেখেছে ইলা। তা হলে! আজকাল সারাক্ষণ কেমন একটা অসহায় বোধ করে নমন। চারদিকে যেন গিঁট পড়ে আছে। যেন আটকে আছে সব।

এই যেমন গতকাল রুপিন ডেকে পাঠিয়েছিল ওকে।

বিজনের কাজ থেকে ফিরে প্রায় রাত এগারোটা নাগাদ নমন গিয়েছিল রুপিনের কাছে। গরমকাল। রুপিন বাইরের ঘরে আদুড়গায়ে লুঙ্গি পরে বসেছিল। ওকে দেখে হেসে খুব ভদ্রভাবে বসিয়েছিল চেয়ারে। বলেছিল, "তুমি এত রাত করলে! আমি তো ভাবলাম তুমি আর আসবেই না!"

নমন বলেছিল, "কী করব! চাকরি তো! তাই আর কী!"

মাথা নেড়েছিল রুপিন। বলেছিল, "নিজের অমন দোকান থাকতে কী যে করলে! তুমি কিছুতেই পারবে না টাকাটা দিতে! মানে কোনওভাবেই না! তা হলে কী আর করা যাবে!"

মাথা নামিয়ে বসেছিল নমন। রাতের শব্দ ভাসছিল হাওয়ায়। মাথার ওপর পুরনো দিনের পাখার ঘড়ঘড় শুনতে পাচ্ছিল। রাস্তা থেকে কুকুরদের চিৎকারও শুনতে পাচ্ছিল। আর একটা অস্বস্তিজনক নিস্তব্ধতা মাকড়শার জালের মতো ছড়িয়েছিল ওর আর রুপিনের মাঝে।

রুপিন বলেছিল, "এখনও একটু সময় আছে। ট্রাই করো নমন। তুমি মন দিয়ে ট্রাই করছ না। একটা ফাইনাল কিছু করো। বেকার হাতছাড়া কোরো না সুযোগটা। কফি শপ হলে মাসে অনেক টাকা পাবে। জীবন সেট হয়ে যাবে। বুঝেছ?"

রাতে একা একা বাড়িতে ফিরছিল নমন। আলোয় ভেসে যাওয়া কলকাতায় রাত নামছিল বকুলফুলের শব্দে। নিজের অস্পষ্ট ছায়াকে দেখছিল কখনও লম্বা হচ্ছে, কখনও ছোট হচ্ছে। মনে হচ্ছিল জীবনও কি এমনই অনিশ্চিত! এমন অস্পষ্ট! চারপাশে এই যে শান্তিময় একটা শহর দেখা যাচ্ছে, সেটা কি শান্তি নয়! আসলে ভেতরে ভেতরে এই শহরটাও কি ওর জীবনের মতোই অস্থির হয়ে আছে?

বাড়ি ফেরার পথে বাবুদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে ওদের বারান্দার দিকে তাকিয়েছিল নমন। দেখেছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনু। কিন্তু চোখ রাস্তার দিকে নয়। দূরে অন্য কোথায় যেন। মেয়েটা এত করে কেন ওর জন্য! আর ও কী করতে পারে তার বদলে! না, জীবন বিনিময় প্রথা নয়, কিন্তু সব কিছুরই তো একটা প্রযোজ্যতা থাকে!

মাথা নিচু করে রাতের শহর পেরিয়ে গিয়েছিল নমন। নিজেকে বড্ড ছোট আর অপদার্থ লাগছিল।

আচমকা ফোন বাজল পকেটে। কে আবার! ফোনটা বের করল নমন। মিনু।

"হ্যাঁ মিনু। বলো," নমন কানে লাগাল ফোনটা।

"আমাদের হয়ে গিয়েছে। আমরা বাড়ি গেলাম। তুমি চিন্তা কোরো না। কাজ সেরে তুমি ধীরেসুস্থে এসো, কেমন?"

"আচ্ছা," নমন হাসল। যাক হয়ে গিয়েছে।

"আর-একটা কথা," মিনু সামান্য থমকাল।

"কী?"

"কিছু খেয়ে নিয়ো। তুমি তো সকালে সেই একটু মুড়ি খেয়ে এসেছ! কাকিমা বলছিল। কিছু খেয়ে নিয়ো নমনদা। আমার খুব চিন্তা হয়। আমি রাখছি," মিনু রেখে দিল।

এসবের মধ্যেও নমনের আচমকা কী যে ভাল লাগল! মিনুর চিন্তা হয়! সত্যি? ওর জন্যও কারও চিন্তা হয়! কোল্ড ক্রিমের মতো ঠান্ডা আর সুন্দর একটা প্রলেপ যেন পড়ল মনের মধ্যে।

ফোনটা রাখার আগে সময় দেখল নমন। সাড়ে চারটে বাজে। কোথায় গেল বিজন?

ও ঠিক ডিসান মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে নেই। কিছুটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনের সিগনালটা খোলা। ফোনটা রেখে ও মোড়ের দিকে তাকাল। ওর চোখ আবার পড়ল সেই লোকটার দিকে। চাকা লাগানো পিঁড়িতে বসে রয়েছে মানুষটা। রাস্তা পার করবে বলে অপেক্ষা করছে। আর ঠিক সেই সময় বিজনকেও দেখতে পেল ও। ওই দিকের রাস্তা পার করে বিজন মাঝের ডিভাইডারে উঠল।

সিগনাল খোলার ঠিক আগে আচমকা একটা স্পোর্টস বাইক গাঁ গাঁ করে বাইপাসের দিক থেকে বাঁক নিল এই রাস্তায়। আর সিগনালটাও বন্ধ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

পিঁড়িতে বসা মানুষটা কোনও দিকে না-তাকিয়ে নিজের মনে রাস্তায় নামল। তারপর হাত দিয়ে টেনে টেনে রাস্তার অন্যদিকে এগোতে লাগল।

স্পোর্টস বাইকটা পিঁড়িতে বসা লোকটাকে কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আর-একটু পেছনে এবার অন্য একটা বাইককে আসতে দেখল নমন। সেটা বিশাল বড়। মেঘ গর্জনের মতো আওয়াজ। হু হু করে আসছে সেটা।

এমন করে দুটো বাইক যাচ্ছে কেন? একে অন্যকে তাড়া করছে নাকি!

পিঁড়িতে বসা লোকটা এবার ঘাবড়ে গেল খুব। একটা বিশাল বাইক চারদিক কাঁপিয়ে দৌড়ে আসছে। আশপাশের সবাই চিৎকার করছে। তার প্রায় সামনে পড়ে গিয়েছে পিঁড়িওলা মানুষটা। বাইকওলা লোকটা শেষ মুহূর্তে বাইকের হাতল ঘোরাল। ব্রেকও মারল কি?

নমন দেখল, বাইকটা তেরছাভাবে ঘুরে লাফিয়ে উঠল আর তারপর সোজা গিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে ধাক্কা মারল বিজনের বুকে। বাইকচালক ছিটকে পড়ল দূরে ডিভাইডারের পাশে রাখা একটা লোহার রেলিংয়ের গায়ে। আর ধাক্কা খেয়ে বিজন পড়ে গেল ডিভাইডারের ওপর। মাথাটা লাগল ডিভাইডারের কোনায়। আর নিমেষে তরমুজের মতো ফেটে গেল। অত বড় বাইকটাও বিজনের বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। মুখ দিয়ে ফেনার মতো রক্ত বেরিয়ে এল বিজনের। বিজন যে আর নেই সেটা এত দূর থেকেও বুঝতে পারল নমন।

ওর হাত-পা কাঁপছে। কী হয়ে গেল এটা! নিমেষের মধ্যে এটা কী হল! এখন কী করবে ও? বিজন তো পড়ে আছে। লোকে পিলপিল করে দৌড়চ্ছে ওইদিকে। ও কি যাবে? কিন্তু পুলিশ আসবে যে। ওর ব্রিফকেসে

এত টাকা! একটা রিভলভার! পুলিশ যদি দেখতে চায়! এসবের কী জবাব দেবে! ওকে যে ধরে নিয়ে যাবে! তা হলে এখন কী করবে?

লোক বাড়ছে। চারদিকে ভিড়। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ছে। জ্যাম লাগছে। ওই পুলিশ আসছে। লম্বা সার্জেন্টের মাথা ভিড়ের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। এবার কী করা উচিত!

চোয়াল শক্ত করে দাঁড়াল নমন। তারপর ভাবল যা হয় হবে। জীবনে কোনওদিনও ও অন্যায় কিছু করেনি। কিন্তু এবার করবে! এই টাকা ওর নয়। কিন্তু তাতে কী! এখানে যে এই টাকা নিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ও ছাড়া আর একজন মাত্র জানত। কিন্তু একজনটি আর নেই। তা হলে টাকার বিষয়ে আর কে জানে? কেউ না!

ও দ্রুত এগিয়ে গেল সেই হলুদ ট্যাক্সির দিকে। চালক লোকটি গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখছে কী হল, কিন্তু কাছে যায়নি।

নমন বলল, "এখানে জ্যাম হচ্ছে দাদা, কিন্তু সামনে গড়িয়াহাটের দিকটা এখনও ফাঁকা! আপনি কি যাবেন আলিপুরে? খুব জলদি আছে আমার। প্লিজ় যাবেন?"

লোকটা দ্রুত মিটার নামিয়ে এসে দরজা খুলে সামনে বসল। বলল, "জলদি বসুন ভিড় বাড়ার আগে। না-হলে সমস্যা হবে।"

গাড়িতে বসে সুটকেসটাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরল নমন। একবার পেছনে ফিরল। ভিড় বাড়ছে আরও।

ও বলল, "দাদা, একটু তাড়াতাড়ি যাবেন প্লিজ়?"

চালকটি গাড়ি ওড়াচ্ছে যেন! ভাগ্য ভাল যে, গড়িয়াহাটার সিগনাল খোলা। ও দেখল, পুলিশের গাড়ি হুটার বাজিয়ে যাচ্ছে ডিসান মোড়ের দিকে।

রাসবিহারী পেরিয়ে গাড়ি ডান দিকে বাঁক নিল। মোবাইল খুলে সময় দেখল নমন। পাঁচটা বাজতে দশ। প্লেন লেট আছে বলেছিল বিজন। ও কি পারবে ইলাকে বাঁচাতে? ও আবার সামনে ঝুঁকে চালককে বলল, "প্লিজ় দাদা!"

পাঁচটা তিন। গাড়িটা গিয়ে থামল আলিপুরের বড় বাড়িটার সামনে। কোনওমতে ভাড়া মিটিয়ে গাড়ি থেকে ছিটকে নামল নমন। ব্যাগটাকে শক্ত করে ধরল বুকের কাছে, তারপর লিফটের দিকে দৌড়ল।

ওপরে পৌঁছে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল নমন। কোন ফ্ল্যাটটা যেন? ও ওই তো!

দরজায় গিয়ে বেল বাজাল নমন। একটু সময় নিল। তারপর আবার বাজাল বেল। কেন খুলছে না সুমিদি!

ওই যে আসছে। পায়ের আওয়াজ পেল দরজার ও-পাড়ে। তারপর লক খোলার আওয়াজও পেল।

দরজা খুলে নমনকে দেখে সুমিদি অবাক হল, "তুমি!"

নমন একরকম ধাক্কাই মারল সুমিদিকে। তারপর ডাকল, "ইলা, ইলা!"

সুমিদি ঘাবড়ে গেলেও নিজেকে ঠিক করল, "কী হয়েছে? এমন করছ কেন?"

নমন মিথ্যে বলল, "পুলিশে রেড করবে এখানে। স্যার আমায় বললেন ইলাকে এখান থেকে সরাতে। আপনিও কাটুন।"

সুমিদি ঘাবড়ে গিয়েছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজা খুলে দিল।

নমন দেখল ইলাকে। মেয়েটার মুখ সাদা। কাঁপছে।

নমন এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল ওর, "চলো। আর এক মুহূর্ত নয়। চলো তুমি!"

ইলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল নমন। লিফট ওপরে উঠে গিয়েছে। আর অপেক্ষা না-করে সিঁড়ি দিয়ে নামল ওরা। আর পেছনে তাকাল না। রাস্তায় বেরিয়ে, দৌড়ে যতটা সম্ভব দূরে চলে এল বাড়িটার কাছ থেকে।

ইলা হাঁপাচ্ছে। ঘেমে গিয়েছে। চুল এলোমেলো। কী হল এটা যেন বুঝতে পারছে না।

নমন হাত ছেড়ে দিল ইলার। বলল, "কী করতে যাচ্ছিলে তুমি? পাগল হয়ে গিয়েছ!"

ইলা তাকিয়ে রইল নমনের দিকে তারপর আচমকা ওকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল।

নমন সামান্য সময় দিল ইলাকে। তারপর জোর করে ইলাকে সরিয়ে দিল। নিজের রুমাল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "নাও, চোখ মোছো। কী যে করো! এখান থেকে সোজা বাড়ি যাবে। আর কোনওদিকে নয়। ওই সিনেমা আর হবে না। অন্য কাজ দ্যাখো।"

"হবে না!" ফ্যালফ্যাল করে তাকাল ইলা। চোখ মুছল।

"না, বাড়ি যাও। আমাদের আজকের পরে আর দেখা হবে না কোনওদিন। বুঝলে? বিজনবাবু মারা গিয়েছেন। না, কোনও কোয়েশ্চেন নয়। বাড়ি যাও ইলা," নমন চোয়াল শক্ত করল।

নমন ইলাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পেছন ঘুরল। ওই দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করানো আছে। ওটা ধরতে হবে।

ও শুনল ইলা কাকে যেন ফোন করছে, বলছে, "বাদুদা আপনি কি... মানে... কাল দেখা করতে পারবেন?"

ট্যাক্সিটা ধরল নমন। একটা ছোট্ট কাজ আছে ওর। এই টাকার ব্যবহার শুরু করবে এবার। নতুন জীবনের চাবিকাঠি এই টাকা। বিজন বলেছিল, ও যেন ক্যালানে না হয়! এই সময়ে ভাল মানুষকে হয়তো এরকম নামেই ডাকে লোকজন। অনেক হয়েছে ভালমানুষি, আর নয়।

এই টাকা দিয়েই নমন শুরু করবে নতুন জীবন। আজ রাতেই রুপিনের কাছে যাবে। টাকা দিতে আর অসুবিধে নেই ওর। এবার নিজের জীবনটাকে সেট করে নিতে হবে।

কিন্তু তার আগে অন্য একটা কাজ আছে। মিনুর আঙুলের ওই সাদা দাগটা ঢেকে দিতে হবে ওকে। মিনুর মতো মেয়েকে আর যেতে দেবে না এই জীবন থেকে।

মিনুর জন্য এবার সুন্দর দেখে একটা আংটি কিনবে নমন। ও জানে, মিনু আপত্তি করবে। কিন্তু না, আজ আর ওর কোনও আপত্তি শুনবে না নমন।

উনিশ

চাবিটা হাতে নিয়ে কেমন যেন একটা ভারমুক্ত হল সাজু। দিদির ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা যে এভাবে মিটে যাবে, সেটা ভাবতেও পারেনি।

বাইরে এখন বিকেল। হাওয়া দিচ্ছে। গরমটা কি আজ একটু কম? হতে পারে। আসলে মন ভাল থাকলে সব কিছুই বোধ হয় এরকম ভাল আর সুন্দর লাগে। তবে ক্লান্ত লাগছে। সোজা এয়ারপোর্ট থেকে এসেছে যে ও! দু'দিনের জন্য আহমেদাবাদ গিয়েছিল। সেখানে খুব খাটনি গেছে। লোগোর ডিজাইন যা পাঠানো হয়েছিল, সেটা ভুল ছিল। তাই ওখানে বসেই সেটা নতুন করে বানিয়ে, পার্টিকে দিয়ে আবার অ্যাপ্রুভ করিয়ে নিতে হয়েছে। তারপর একটা টেস্ট স্যাম্পেল ও সামনে বসেই করিয়ে নিয়েছে। আলেসান্দ্রোর ভাল লেগেছে এই কাজটা।

কিন্তু এই সব কিছুতে এতটা চাপ গিয়েছে যে, ঘুমনোর সময় পায়নি। এমনিতেই এখানে আসার পর থেকে ঘুম হচ্ছিল না। তারপর পরপর দু'রাত ঘুম নেই। শরীরটা আর বইছে না। ভেবেছিল প্লেনে ঘুমিয়ে নেবে একটু। কিন্তু প্লেনটা সারা রাস্তায় এতটাই নাচতে নাচতে এসেছে যে, ঘুমের কোনও সুযোগই ছিল না। উপরন্তু ওর পাশে বসা একটি অল্পবয়সি মাড়োয়ারি মেয়ে সারাক্ষণ ওই টার্বুলেন্সের জন্য ভয় পেয়ে ওর সঙ্গে কখনও বকবক করে আবার কখনও ওর হাত চেপে ধরে ভগবানের নাম করে গিয়েছে! খুবই বিরক্ত লেগেছে সাজুর। কিন্তু ওর সমস্যা হল, ও কাউকেই বলতে পারে না কিছু। সব বুঝেও চুপ করে থাকে।

এয়ারপোর্টে নেমে ফোন অন করার পরে বেশ অবাক হয়েছিল সাজু। রুনুদি তো এত মেসেজ করে না! তা হলে?

গাড়ি বুক করে রুনুদিকে ফোন করেছিল সাজু।

"তুই নেমেছিস?" রুনুদির গলাটা সামান্য চিন্তান্বিত লাগছিল।

"কী হয়েছে রে? কোনও প্রবলেম?" সাজু জিজ্ঞেস করেছিল।

"শোন না, আমার পায়ের ব্যথাটা আবার বেড়েছে। একটা কাজ করতে পারবি? জিতেশ বারিকের নাম শুনেছিস? আমাদের এখানকার একজন মন্ত্রী। ওঁর কাছে একবার যাবি? আমি ঠিকানা পাঠিয়ে দিচ্ছি তোকে। ফ্ল্যাটের একটা হিল্লে হয়ে গিয়েছে। তুই গেলে চাবিটা দিয়ে দেবেন। তুই কি যেতে পারবি? তা হলে ব্যাপারটা মিটে যেত আর কী!"

ব্যাপারটা কী হল? ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে! কী করে মিটল? আর কে মেটাল? ও তো কিছু করেনি! কিছুই বুঝতে পারেনি সাজু। কিন্তু রুনুদিকে আর ফোনে কত কথা বলবে!

ও শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "কী ব্যাপার!"

"তুই আগে নিয়ে আয় চাবি। তারপর বলছি। আমি মেসেজ করছি তোকে ঠিকানাটা। রাখলাম," রুনুদি রেখে দিয়েছিল ফোন। তার একটু পরেই ঠিকানাটা এসেছিল।

একবার গাড়ি বুক করেছে। আর গাড়ি এসেও গিয়েছে। এই অবস্থায় ও গাড়ির ডেস্টিনেশন আবার পালটে দিয়েছিল। তারপর সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছিল কী হল ব্যাপারটা। কীভাবে হল এসব! তবে ভালও লাগছিল ওর। মনে হয়েছিল রুনুদি খুব টেনশনে ছিল। যাক, সেটা ভালয় ভালয় মিটে গেল।

জিতেশ বারিকের সঙ্গে দেখা করার আগে ওকে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ওই পার্টি অফিসে বসে ঘুমে প্রায় বুজে আসছিল চোখ। শরীরের ভেতরে কী যে কষ্ট হচ্ছিল বলে বোঝানো যাবে না। মনে হচ্ছিল সামনের মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

বেঁটে, ক্ষয়াটে চেহারার একজন ভদ্রলোক ওকে দু'বার চা খাওয়ার জন্য অনুরোধও করেছিল। কিন্তু হেসে বারণ করে দিয়েছিল সাজু। আসলে চা খায় না তো ও।

জিতেশ বারিক অবশেষে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওকে। ভদ্রলোককে দেখে ও চিনতে পারেনি। পারার কথাও নয়। কারণ, ও তো আর এ দেশে থাকে না।

না, বিশেষ কথা বলেননি জিতেশবাবু। হরি নামে ওঁর যে-সেক্রেটারি তার সঙ্গেই বেশ কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তারপর হরিকে দিয়েই ডেকে পাঠিছিলেন রতিশ বলে লোকটিকে।

এতক্ষণ ভদ্র মার্জিত যে-জিতেশকে দেখেছিল সাজু, এই রতিশ লোকটির সামনে যেন সেই জিতেশই পালটে গিয়েছিলেন পুরো।

তারপর কী ঝাড়! রতিশের হাল দেখে ওর নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল। আসলে ওর সামনে কোনও মানুষের হেনস্থা হলে ও নিতে পারে না। ও মনে করে, সব মানুষেরই একটা ন্যূনতম সম্মান থাকে।

মাথা নিচু করে বসেছিল সাজু। ও নিজেই যেন লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল একদম। ফ্ল্যাটের চাবিটা ওর সামনে রেখেছিল রতিশ। তারপর বেরিয়ে গিয়েছিল।

রতিশ চলে যাওয়ার পরে একটু সময় নিয়েছিলেন জিতেশ। তারপর হেসে বলেছিলেন, "সরি, আপনাকে এসব দেখতে হল। আসলে আমার পার্টির ছেলে। কিন্তু যা হয় আর কী! হিরো হয়ে যায় সামান্যতেই। মাঝে মাঝে ছেঁটে মাপমতো করে দিতে হয়। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার দিদিকেও বলুন, আর কিছু প্রবলেম হবে না। কিছু হলে জানাবেন আমায়। আসলে লাজনি না-বললে তো আমরা জানতেই পারতাম না!"

লাজনি! মানে টুপু! এর মধ্যে টুপু এল কোথা থেকে! অবাক হয়ে সাজু তাকিয়েছিল জিতেশের দিকে। জিতেশ বলেছিলেন, "যাক, আমি এবার একটু বেরব। এক জায়গায় যেতে হবে। আপনি যদি..."

সাজু উঠে দাঁড়িয়েছিল। সত্যিই তো, মন্ত্রী মানুষ। ব্যস্ত থাকেন।

"আমি আসছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ," বলে চাবিটা পকেটে ঢুকিয়ে ব্যাগ নিয়ে বাইরে চলে এসেছিল ও।

এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সাজু। গাড়ি বুক করেছে একটা। ওই যে সেটা আসছে। ঘুমে বুজে আসছে চোখ। মাথা কাজ করছে না। চারদিকে সব কেমন যেন হালকা ঢেউ লেগে নড়তে থাকা নৌকার মতো দুলছে! তার মধ্যেও একটা নাম যেন ভেসে রয়েছে! লাজনি, টুপু! টুপু এসব করেছে! কিন্তু কীভাবে! একদিনে তো এটা সম্ভব নয়! তা হলে? রুনুদি তো ওকে এই নিয়ে কিছু বলেনি! ওর অলক্ষে তা হলে এত কিছু ঘটে গিয়েছে!

গাড়িতে উঠেও কেমন একটা লাগছিল! টুপু এটা করল! কীভাবে! কিন্তু টুপু তো রাগ করেছিল ওর ওপর! কীসব প্রেমের রিকিন্ডল না কী যেন বলেছিল! টুপু কি ভাবে যে, লাবণ্যর সঙ্গে ওর প্রেম আছে! এখনও! ও কি জানে সেসব কতদিন আগে চুকেবুকে গিয়েছে! কবে সেই প্রেম ও আর্নো নদীর জলে ফেলে দিয়েছে! টুপু জানে কীভাবে ওই ছাদের ঘরেই কঠিন মুখে ওকে নিজের জীবন থেকে সরে যেতে বলেছিল লাবণ্য। বলেছিল, "অন্য একজনকে আমি ভালবাসি! ওকেই আমার আপন মনে হয়। তুই সরে যা সাজু। তুই আমার কেউ নোস আর!"

কষ্ট হয়েছিল সাজুর। তবে কয়েকদিন পরে মনে হয়েছিল, লাবণ্যও তো একটাই জীবন পেয়েছে। ওই-বা কেন ইচ্ছেমতো বাঁচতে পারবে না! তাই একটুও জোর করেনি। আর ছোট থেকেই মনখারাপ হলে সবার থেকে সরে যায় সাজু। ঝগড়াঝাটি করতে পারে না একটুও। তাই এখানেও সরেই গিয়েছিল।

আর সরতে সরতে কোথা দিয়ে যে পনেরো বছর কেটে গেল! ওর আর এই জীবনের মধ্যে কত যে নদী, সমুদ্র, পাহাড় আর মহাদেশ এসে ঢুকে পড়ল! সেই লাবণ্য কবে হারিয়ে গিয়েছে মন থেকে। এখন দেখলে বা মনে পড়লেও কিছুই অনুভূত হয় না। দিঘির জল কাঁপে না। ব্রিজ নাড়িয়ে আর চলে যায় না ট্রেন। শিলাবৃষ্টি ঝরে পড়ে না জীবনের সমস্ত উঠোন জুড়ে। আর্নো নদীর ধারে, সন্ধে হয়ে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে জ্বলে ওঠা সারি সারি আলোয় সেই মুখটা ভেসে ওঠে না আর।

তা হলে কি অন্য মুখ ভাসবে এরপর থেকে! তা হলে কি অন্য কেউ থাকবে? না-বলা কথার মধ্যে? লবঙ্গ আর দারুচিনির ঘ্রাণের মধ্যে! পাথুরে রাস্তায় হেঁটে আইরিশ পাবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কি এবার থেকে তা হলে অন্য কারও জন্য মনখারাপ করবে সাজুর! মনে হবে, জানিয়ে এলাম না কেন একবার! আহমেদাবাদ যাওয়ার আগের দিন ওইটুকু মেয়ে যা বলেছিল, সেটাই কি ঠিক?

গড়িয়াহাট থেকে কেনা দাবাটা নিজেই সাজুর ঘর থেকে আবিষ্কার করেছিল রেমি। আর তারপর তক্ষুনি জোর করে খেলতেও বসিয়েছিল ওকে। পরে যে রেমিকে গিফট দেবে ভেবেছিল সাজু, সেসব আর হয়নি।

এই অল্পদিনেই মেয়েটা বড্ড মায়ায় জড়িয়েছে। একটা জিনিস সাজু বোঝে। প্রেম ভালবাসা এক জিনিস। তার টানও খুব। কিন্তু মায়ার চেয়ে তীব্র আর কিছু হয় না এ পৃথিবীতে।

খেলায় রেমি হেরে গিয়েছিল। তাতে মেয়েটা দমেনি একটুও। বরং বলেছিল, "নাও তোমায় জিতিয়ে দিলাম। দু'দিন পরে চলে যাবে তো। মনখারাপ নিয়ে যাবে এটা আমি চাই না!"

খুব হেসেছিল সাজু। দেখেছিল ওর হাসি দেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেমি। তারপর বলেছিল, "এটা লাফিং ক্লাব নাকি? আর আমি কি জোকার?"

সাজু মাথা নেড়ে বলেছিল, "তুমি একটা পাগলি!"

রেমি গম্ভীরভাবে বলেছিল, "বলো, কী জানতে চাও তুমি? এনি ইনফো। বলো।"

সাজু হেসে বলেছিল, "কিছু না। আমার কিছু জানার নেই।"

"ঠিক আছে, ফ্রি ফান্ডে একটা নিউজ় তোমায় দিয়েই দিই। তুমি যদি কোনওদিন টুপুমাসির ঘরে যাও, দেখবে টেবিলে একটা মোটা বই রাখা আছে। সেটা জাস্ট খুলে দেখো। কেমন?"

বাড়িতে গিয়ে সুটকেসটা রাখল সাজু। রুনুদির হাতে দিল চাবিটা। তারপর সুটকেস খুলে বের করল একটা প্যাকেট।

রুনুদি চাবিটা নিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল বারবার। তারপর বলল, "সত্যি, মেয়ে বটে টুপু। ও না থাকলে এটা হতই না। তুই রাগ করিস না সাজু, কিন্তু ও তোকে কিছু বলতে বারণ করেছিল। তাই বলিনি। আসলে ও শিয়োর ছিল না কিছু করতে পারবে কি না। মেয়েটা খুব ভাল। আজকাল কে আর কাকে গায়ে-পড়ে উপকার করে বল?"

সাজু হেসেছিল। বলেছিল, "আমি চট করে একবার আসছি। এসে বাকিটা শুনব।"

"কিন্তু তোকে তো খুব ক্লান্ত লাগছে। কোথায় যাচ্ছিস এই অবস্থায়?" রুনুদি সামান্য অবাক হল।

সাজু বলল, "যাতে বাকি জীবনটা ক্লান্ত না থাকি, সেটার একটা বন্দোবস্ত করে আসি।"

রুনুদি কিছু বলতে গিয়েও বলল না। সামান্য মাথা নাড়ল নিজের মনে। হাসল। তারপর বলল, "মন খুলে বলবি। বুঝেছিস? খুব অভিমানী কিন্তু! এখন বুঝতে পারছি কেন তোকে কিছু বলতে না করেছিল! অভিমানী পাগলি একটা!"

আজ মেমদিদার বাড়িটা কেমন শুনশান লাগছে। পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে সেই গাছটার দিকে তাকাল সাজু। আর অবাক হয়ে গেল। হাসল নিজের মনে। তারপর পা চালিয়ে এগিয়ে গেল মূল বাড়ির দিকে।

না, আজ মেমদিদার ঘরের দিকে গেল না। বরং বড় উঠোনটা ঘুরে অন্যদিকে গেল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

নীল রঙের দরজা। তার উপরে নাম লেখা। কলিং বেল বাজাল সাজু।

একটু সময় পরে দরজা খুলে দিল টুপুর মা।

সাজু হেসে বলল, "কাকিমা, আমি সরযু। চিনতে পারছেন? টুপু আছে? ওর জন্য একটা জিনিস নিয়ে এসেছি আসলে। আহমেদাবাদ গিয়েছিলাম। সিন্ধি মার্কেট থেকে..."

"এসো এসো," কাকিমা সরে দাঁড়ালেন, "ঘরে এসো।"

সাজু ভেতরে ঢুকে জুতোটা খুলে রাখল একপাশে।

"এদিকে এসো। টুপু এখনও ফেরেনি। তবে ফিরবে। আমাদের দিকটা তো ছোট। তাই বসার ঘর সেভাবে নেই। তুমি টুপুর ঘরে বোসো। কিছু মনে করলে না তো!" কাকিমা দ্বিধার সঙ্গে বললেন।

"না না, আমি বরং পরে আসব কাকিমা। আমার ফোন করে আসা উচিত ছিল। এটা মানে... টুপুর জন্য..." সাজু হাতের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল।

"পাগল! তুমি এসে না-বসে চলে গিয়েছ জানলে মেয়ে আমায় আস্ত রাখবে? তা ছাড়া কতদিন পরে এলে! চলো ওর ঘরে। বোসো একটু।"

কাকিমা এমন জোর দিয়ে বলল যে, সাজু না করতে পারল না।

টুপুর ঘরটা মাঝারি মাপের। আর কী সুন্দর করে সাজানো! একপাশে বিছানা। আলমারি। আর অন্যপাশে সোফা। তার সঙ্গে লাগোয়া টেবিল আর চেয়ার।

কাকিমা এসি চালিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি বাবা একটু বোসো। আমি আসছি।"

চারদিক নিঝুম। এসি চলছে শুধু। হাতের প্যাকেটটা পাশে রাখল সাজু। এদিক-ওদিক তাকাল। এভাবে একটা মেয়ের ঘরে বসে থাকা কি ঠিক! কিন্তু আর কত ঠিক-ভুল বিচার করবে সাজু! সারা জীবন আর কতবার এসব নিয়ে ভাববে? টুপুকে কি ওর পছন্দ নয়? পছন্দ। খুব পছন্দ। তা হলে? এমন গুটিয়ে থাকবে কেন? কিন্তু টুপু যদি ওকে পছন্দ না করে! দেখা হলেই তো কেমন রেগে রেগে কথা বলে! বিরক্তি দেখায়। সেটা কী?

সাজু টেবিলের দিকে তাকাল। মোটা একটা বই রাখা আছে। রেমি কি এই বইটার কথাই বলেছিল? দেখা কি ঠিক হবে?

কেন হবে না! মানুষ তো বই উলটে-পালটে দেখেই! তাতে অসুবিধে কী? বই-ই তো! কারও পার্স তো নয় রে বাবা!

হাত বাড়িয়ে বইটা নিল সাজু। তারপর ফ্লিপ করল। আর তখনই একটা পাতা খুলে গেল। আরে এটা কী! এটা যে ওর সেই কলেজবেলার একটা ছবি! এটা সামলে রেখেছে টুপু! আর রেমি লুকিয়ে দেখেছে এটা!

নিজের অজান্তেই কেন কে জানে হাসল একটু। মনটা কেমন শান্ত হয়ে গেল ওর। আর কী যে ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ! যেন এত বছরের ক্লান্তি এসে ভিড় করল চোখের পাতায়। শরীর ছেড়েই দিল একদম। জেগে থাকার চেষ্টা করল সাজু। বোঝানোর চেষ্টা করল নিজেকেই যে, অন্য একজনের বাড়িতে বসে আছে ও। এখানে ঘুমোতে নেই।

কিন্তু মন যেন আর শুনছে না। শরীর যেন বলছে এত বছরের যাত্রা শেষ হল যে! এবার কি একটুও বিশ্রাম নেবে না?

সাজুর মাথাটাও যেন নিভে এল। ও নিজের অজান্তেই কাত হয়ে ধীরে ধীরে ডুবে গেল সোফায়। আর দেখল আর্নো নদীর পাড়ে বসে আছে ও। আর ওর সামনে কে বসে? টুপু! টুপুর গালে এসে পড়েছে টাস্কান রোদ। আর হাওয়ায় উড়ছে ওর চুল। ঠোঁটের ওপরের তিলটাও কী স্পষ্ট!

টুপু তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হাসছে। আর হাত বাড়িয়ে গালের ওপর লেগে থাকা কুটো সরিয়ে দিয়ে বলছে, "আর কারও কাছে যদি যাও, দেখো, কুচিয়ে নুন দেব তোমায়!"

ঘুমের মধ্যে আলতো করে হাসল সাজু। ও জানলও না, কাচের জানলার ওপার থেকে একটা ছোট্ট পাখি ওকে দেখল একবার। তারপর ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল নিজের বাসার দিকে।

আর বহু বছর পর আবার সেই ছোটবেলার মতো ঘুম এসে ঘিরে ধরল সাজুকে।

কুড়ি

মাথায় আগুন লাগলে কেমন লাগে, সেটা ভাল করে বুঝতে পারছে টুপু। ও যত ভাবে, কারও সঙ্গে ঝামেলায় যাবে না, কিন্তু তত বেশি করে লোকে যেন পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে চায় আজকাল। অমানুষের চাষ হচ্ছে দিকে দিকে। মাথা ঠিক রাখাই মুশকিল।

এই সময়ের এটাই কি লক্ষণ! ঘরে-বাইরে সবাই আজকাল একরকম। আজ ফোনে মানবও পায়ে পা দিয়ে অসভ্যের মতো চিৎকার করল। এখনও মাথাখারাপ লাগছে। রাগে মাথা ঘুরছে টুপুর। এমনিতেই দু'দিন ধরে বুকের ভেতরটা দমচাপা হয়ে আছে। সেখানে আবার এসব! সত্যি সত্যি মাথায় আগুন লেগে গিয়েছে ওর। মানবকে হাতের কাছে পেলে একদম ছিঁড়ে ফেলত টুপু!

দু'দিন হল সাজু চলে গিয়েছে। না ইতালি নয়, আহমেদাবাদ। কিন্তু যাওয়ার আগে মানুষ তো একবার বলে যাবে! কিন্তু সেই মানুষটার এসব বালাই নেই। আসলে কিছুরই বালাই নেই। একবারও খবর নেয় না ও কেমন আছে, কী করছে! ওকেই সব সময় পোক করতে হয়। খুঁচিয়ে কথা বলতে হয়। যেন ওর দায় সবটাই! এত রাগ হয় টুপুর! মনে হয় ধরে বেঁধে পেটায় খুব। কিন্তু সে লোকটা বুঝলে তো! সে তো নিজের খেয়ালে থাকে। রাত জেগে নিজের ঘরে বই পড়ে, সিনেমা দেখে। বিকেলে মাঝে মাঝে মেমদিদার কাছে আসে। বাকি সময় ওই পুকুরপাড়ে বসে পাখিদের বাসা বানানো দেখে। পাগল কি না কে জানে! এত অন্তর্মুখী কেউ হয় নাকি! নাকি হওয়া উচিত! মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে ওটাকেও মাঝে মাঝে। দুম করে চলে গেল। আরে বাবা একবার তো বলে যাবি!

মাঝে মাঝে এত কষ্ট হয়! কেন ওর ভাল লাগে ওই পাথরটাকে? কেন ওই দিকে মন গেল ওর!

টুপু পড়েছে, কেউ কারও প্রেমে নাকি চার থেকে ছ'মিনিটের মধ্যে পড়ে। ও এখন সেই চার-ছয় মিনিটটাকে অভিশাপ দেয়। ভাবে, সময় জিনিসটাই গোলমেলে।

খেতে ইচ্ছে করে না টুপুর। ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। ও তো জানে, এ মানুষ চলে যাবে। কে জানে হয়তো এখনও লাবুদিকেই মনে নিয়ে ঘুরছে! এসব মনে করলেই সারা গায়ে কেমন যেন চিড়বিড় করে! সারাক্ষণ রেগে থাকে ও। আজ সকালে তো মায়ের সঙ্গেও লেগে গিয়েছিল।

মায়ের তো একটাই টপিক। বাবা। সেই নিয়েই আজ শুরু করেছিল।

কিন্তু আজ আর সেটাকে বাড়তে দেয়নি টুপু। বলেছিল, "তুমি যদি ফারদার এটা নিয়ে আবার কিছু বলো, তা হলে আমি চলে যাব বাড়ি ছেড়ে।"

"কোথায় যাবি? যাবিটা কোথায়! মানবকে তো তাড়ালি জীবন থেকে! এত বয়স হল। তোর সব বান্ধবীদের বাচ্চারা স্কুলে পড়ে আর তুই এখনও ধিঙ্গিপনা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস! লজ্জা করে না!"

"না, করে না লজ্জা। নিজের জীবন বাঁচছি। কাউকে দোষারোপ করছি না। মা, আমার মাথা কিন্তু খুব খারাপ আছে। কী বলতে কী বলে দেব! তখন বিশাল অশান্তি হবে। তুমি আমায় প্রোভোক কোরো না কিন্তু!"

টুপুর চোখেমুখে কিছু একটা ছিল যাতে মা চুপ করে গিয়েছিল। অফিসে বেরনোর সময় শুনছিল মা কাঁদছে আর একা একা গজগজ করছে। বলছে, "আমি তো এই বাড়ির ঝি! দাসীবৃত্তি করার জন্য এসেছি। আমি কেন কিছু বলব? আমি তো এসেছি মুখ বুজে খাটার জন্য! আমি রোজগার করি না বলে সারাক্ষণ অপমান সহ্য করতে হয়। সেদিনের মেয়ে সেও অপমান করছে!"

না, মাকে বোঝাতে যায়নি টুপু। মা এমনই বলে সারাক্ষণ। তারপর আবার ঠিকও হয়ে যায়।

আজ রুনুদির জিতেশ বারিকের ওখানে যাওয়ার কথা। কাজটা হয়ে যাবে। সেটার জন্যও যে ভাললাগা আসবে, সেটাও আসছে না। কারণ ওই একটাই। একটা পাথরের মতো লোক। কোনও কিছুতেই যেন কিছু আসে-যায় না। কাউকে ভালবাসলে যে এমন সারাক্ষণ চোখে বালি পড়ার মতো ফিলিং হয়, আগে বুঝত না। মানবের সঙ্গেও তো সম্পর্ক ছিল ওর। কিন্তু সেখানে তো এমন মনে হয়নি! তা হলে কি মানবকে ও ভালবাসত না!

কোনওদিন এমন ঘেঁটে থাকেনি টুপু। তার মধ্যে একটু আগে মানব ফোন করেছিল।

না, মোবাইলে তো ও মানবকে ব্লক করে রেখেছে। মানব ফোন করেছিল অফিসের ল্যান্ড লাইনে।

টুপু, 'হ্যালো' বলেছিল শুধু আর তারপরেই মানব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

মানব বলেছিল, "ইউ প্যারাসাইট! তোমার লজ্জা নেই!"

"কী হয়েছে? তুমি আমায় এভাবে ফোন করেছ কেন?"

মানব চিৎকার করছিল ফোনের ওপার থেকে। বলেছিল, "তোমার পারসোনাল কাজ তুমি আমার বাবাকে দিয়ে করাচ্ছ! তার হেল্প নিচ্ছ? আমার সঙ্গে যা ছিল সব ওভার। আর সেখানে তুমি এসব করছ! ইউ লিচ!"

"মানব, হোল্ড ইয়োর টাং," টুপুর হাত-পা আবার নিশপিশ করছিল।

মানব বলেছিল, "শাট আপ ইউ বিচ! খালি সুবিধে নেওয়া! জিতেশ আঙ্কেলকে বলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা! লজ্জা লাগে না তোমার?"

"ইউ ফাকার! শাট আপ," টুপু আর পারেনি নিজেকে আটকাতে, "ইউ রেপিস্ট পিগ। নিজের দিকে দ্যাখো! আমি যা করেছি স্যারের সঙ্গে আলোচনা করেই করেছি! হু দ্য ফাক আর ইউ? গো ফাক ইয়োরসেলফ," বলে ফোনটা কেটে দিয়েছিল টুপু। আগুন লেগে গিয়েছিল মাথায়।

সেই আগুন জ্বলছে এখনও! গত আধঘণ্টা কোনও কাজ করতে পারেনি টুপু। মনই দিতে পারছে না। মোহিতের সঙ্গে যে-কথা হয়েছিল রুনুদির বাড়ি নিয়ে, সেটা আবার মোহিত নিজেদের বাড়িতে গিয়েও বলেছে! মানব সেই জন্যই তো এসব বলে অপমান করতে সাহস পেল!

না, এই অপমান সহ্য করা যায় না। কিছুতেই যায় না। এর একটা বিহিত করতেই হবে। এইভাবে থাকার কোনও মানে হয় না।

কেবিনের দরজায় টোকার শব্দ হল একটা।

"হ্যাঁ," টুপু মুখ তুলে তাকাল।

তপনদার মাথাটা দেখা গেল, "ম্যাডাম, সাহেব আপনাকে ডাকছেন।"

এইটাই তো ভাবছিল টুপু। ও নিজেও যেতে চাইছিল মোহিতের কাছেই।

কোনও উত্তর না-দিয়ে উঠল টুপু। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে মোহিতের ঘরের দিকে এগোল।

মোহিত নিজের ঘরেই বসেছিলেন। কিছুটা যেন অপেক্ষাই করছিলেন টুপুর জন্য মনে হল।

টুপু দরজা খুলে ঢুকল। মাথাটা এতটাই গরম হয়ে আছে যে, নক করতেও ভুলে গেল ও।

মোহিত ওকে দেখে হাসার চেষ্টা করলেন। তারপর হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বোসো।"

বসল না টুপু। বলল, "আই ওয়ন্ট টু সে সামথিং স্যার।"

"কী হয়েছে? এত অ্যাজিটেটেড কেন তুমি? মানব..."

মোহিতকে কথা শেষ করতে দিল না টুপু। বলল, "স্যার, আই ওয়ন্ট টু রিজ়াইন।"

"হোয়াট! কী বলছ তুমি? পাগল নাকি!"

"সে আপনি যাই বলুন স্যার, আমি এই হিউমিলিয়েশন নিতে পারছি না। মানব আমায় ফোনে যে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে, সেটার পর আমি আর কাজ করতে পারছি না এখানে," কথাটা বলতে বলতে রাগে অপমানে কষ্টে চোখে জল চলে এল ওর।

"লাজনি!" মোহিত চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন এবার, "বোসো। বোসো বলছি।"

টুপুকে জোর করে চেয়ারে বসালেন মোহিত। তারপর বললেন, "তুমি আমার মেয়ের মতো। মানবকে আমি মানুষ করতে পারিনি। তাই ও অমন হয়েছে। আমি ক্ষমা চাইছি ওর পক্ষ থেকে। আর-একটা কথা জেনো, ওকে আমি কিছু বলিনি। জিতেশ কথাচ্ছলে বলে ফেলেছে ওকে। তুমি কেন রাগ করছ? এমন রাগ কোরো না। আর এতে কেউ চাকরি ছাড়ে! শোনো, ইউ টেক আ ভেকেশন। গো সামহোয়্যার। সময় কাটাও। ফ্রেশ হও। ফিরে এসে কাজে যোগ দাও। বুঝেছ?"

টুপু তাকাল মোহিতের দিকে।

মোহিত মাথায় হাত দিলেন টুপুর। বললেন, "তুমি একদম বাচ্চা একটা মেয়ে! মানব আমায় ফোন করেছিল এই কথাটা বলার জন্য। ভেবেছিল খুব গুণের কাজ করেছে। ওকে আমি যা বলার বলেছি। তুমি একদম ইজি থাকো। আই অ্যাম সরি। আজ তুমি বাড়ি যাও। মনখারাপ কোরো না। কাল এসো, কাজ করো। আবার চাকরি ছাড়ার কথা বললে এমন বকব না!"

টুপু মাথা নামিয়ে ঝরঝর কেঁদে ফেলল এবার। দু'দিনের দমচাপা কষ্টটাই যেন জল হয়ে ঝরে পড়ল এখন। মোহিতের মতো এমন করে তো কেউ বলে না! এমন স্নেহ তো কেউ করে না!

"এই মেয়ে কাঁদবে না! ওঠো, চোখ মোছো। বাড়ি যাও আজ। আর এসব নিয়ে ভাববেই না কিছু," মোহিত মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, "তুমি আমার মেয়ের মতোই। তোমার জন্য আমি কিছু করব না তো কে করবে? ইন ফিউচার কোনও দরকারে আমায় বলবে। এখন যাও বাড়ি। আজ তোমার ছুটি।"

অফিসে মোহিত বলে দিয়েছিলেন। গাড়ি টুপুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। শুধু আসার আগে, বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়েছে ও। তারপর তপনদার দেওয়া একটা কেক খেয়েছে।

রাস্তায় বেশ জ্যাম ছিল। শুনল ডিসান মোড়ে নাকি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে একটা। দু'জন মারা গিয়েছে।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল টুপু। খুব গরম লাগছে। আজ দিনটা এত বাজে! ও ঘড়ি দেখল। পৌনে ছ'টা বাজে। বাড়ি গিয়ে আগে স্নান করবে। তারপর যাবে রুনুদির কাছে। রুনুদি দু'বার ফোন করেছিল। কিন্তু এত মাথাগরম ছিল যে ধরেনি। এবার গিয়েই দেখা করে নেবে।

বাড়িটা আজ বড্ড শুনশান। রেমি বা লাবুদি কেউ নেই। খুদেকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। কোথায় গিয়েছে সব!

টুপু নিজেদের অংশের দিকে গেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওপরে। তারপর কলিং বেল বাজাল।

মা এসে খুলে দিল দরজা।

ও জুতো খুলল ভেতরে গিয়ে। আরে, এটা আবার কার জুতো!

"মা, কে এসেছে গো?" টুপু জিজ্ঞেস করল।

মা হাসল। বলল, "দেখ না গিয়ে। কতদিন পর এল!"

কে এল! মা বলছে না কেন! হাসছে কেন এমন করে! টুপু দ্রুত ঘরের দিকে এগোল। কাকে মা ওর ঘরে বসিয়েছে! আর এ কী! দরজা বন্ধ কেন? এসি চলছে!

ও দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। আর ঢুকেই স্থির হয়ে গেল। মনে হল, বুকের মধ্যে হাজার হাজার হরিণ লাফিয়ে উঠল একসঙ্গে।

টুপু দেখল আধো আবছায়া ঘরে সোফায় ঘুমিয়ে আছে সাজু। মাথাটা কাত হয়ে একদম নুয়ে পড়েছে। চুল এলোমেলো। জামার বোতামের ওপরটা খোলা। সাড় নেই যেন। একদম ঘুমে ডুবে রয়েছে মানুষটা। পাশে একটা প্যাকেট। আর হাতে ওটা কী? আরে ছবি! সাজুর! ওর ওই মোটা বইটার মধ্যের ছবিটা সাজু দেখেছে?

কী লজ্জা! আর কী ভাল! সারা শরীর জুড়ে এক বাগান ফুল ফুটে উঠল টুপুর। ওর মনে হল, আজকের দিনটা এত ভাল কেন!

ও ঝুঁকে পড়ে আলতো হাতে সাজুর কপাল থেকে সরিয়ে দিল চুল। তারপর হাত থেকে ছবিটা নিয়ে রেখে দিল বইয়ের ভাঁজে। আর অবাক হয়ে দেখল ঘুমের মধ্যে সাজু জড়িয়ে ধরল ওর একটা হাত।

নরম আর ঠান্ডা একটা হাত। সাজুর পাশে বসে পড়ল টুপু। না, হাতটা সরাল না। ওইভাবেই রেখে দিল। আর দেখতে লাগল সাজুকে। আবছায়ায় ঘুমিয়ে থাকা একটা মানুষকে।

তারপর কেউ যেন শুনতে না পায় এমন স্বরে টুপু বলল, "তুমি আজ থেকে আমার, কেমন?"

ঠকঠক করে শব্দ হল জানলায়। দেখল, দুটো বাবুইপাখি বসে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। তার মধ্যে একটা পাখি ঠোঁট দিয়ে জানলার কাচে টোকা দিচ্ছে।

কেন দিচ্ছে টোকা? কিছু কি বুঝতে পারছে পাখিরা? টুপু শুনেছে, পাখিদের মন আছে। তাই কি বুঝতে পারছে? কে জানে! পৃথিবীতে সবাই যদি ভালবাসার কথা বুঝত, তা হলে পৃথিবীটা কী সুন্দর জায়গাই না হত!

টুপু হাসল নিজের মনে। বাইরে বিকেল ঘন হতে লাগল। হাওয়া উঠল পূর্ব দিক থেকে। আর ও সাজুর কাছে বসে রইল ওই আবছায়া ঘরে। ভাবল, এমন একটা ঘরে এভাবেই তো সারা জীবন বসে থাকতে চেয়েছিল ও।

অবশেষে বাবুই

"আর দেখতে হবে না, চলো," কুমুদিনী বলল আমায়।

আমি কাচের জানলা থেকে সরে এলাম।

"কী হল, চলো। ওদের একা থাকতে দাও। কিচ্ছু বোঝো না তুমি?" বলেই কুমুদিনী উড়ে আমাদের বাসায় গিয়ে বসল।

আমিও ওর পেছন পেছন গেলাম। যেতে যেতে দেখলাম, সতুদা নিজের ছোট্ট বাসার ব্যালকনিতে বসে আমায় দেখে হাসছে।

আমি বাসায় এসে বসলাম কুমুদিনীর পাশে। দেখলাম, ও ছোট্ট ঠোঁট দিয়ে বাসার বুনট শক্ত করছে আরও।

আমি বললাম, "আসলে প্রথম বানালাম তো, তাই এমন... পরের বার আরও ভাল বানাব। দেখো!"

কুমুদিনী বিরক্ত হয়ে তাকাল আমার দিকে। বলল, "অদ্ভুত! আমি কি কিছু বলেছি! কত বড় মাতব্বর এসেছে রে আমার! আর পরের বার কার জন্য বানাবে বাসা? আর কাকে চাই তোমার! মেরে ফেলব না!"

আমি অবাক হলাম, "তোমার আর বড় বাসা লাগবে না? তা হলে বাসা না-বানানো অবধি আসোনি কেন আমার কাছে?"

"আমার খুশি!" আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল কুমুদিনী, "আমি দেখব না যাকে আমি ভালবাসি, সেও আমাকে ভালবাসে কি না! না দেখেই এমনি এমনি চলে আসব! যখন বাকি ছেলেগুলো মিষ্টি কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে আমায় ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছিল, আমি দেখছিলাম তুমি কী করছ!"

"কী করছিলাম আমি?"

কুমুদিনী তাকাল আমার দিকে। তারপর বলল, "জানি না যাও! সব শুনতে হবে, না? জানো না কী করছিলে?"

আমি কিছু না-বলে তাকিয়ে রইলাম কুমুদিনীর দিকে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। সূর্য তরতর করে আকাশের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে নীচে। পুকুরের জলে ভাঁজ ফেলে হাওয়া বইছে আজ।

ছোট্ট ঘরের সামনে বসে বললাম, "আমি আমাদের বাসা বুনছিলাম তো! নিজের অক্ষমতা, ব্যর্থতা আর মনখারাপ অতিক্রম করে আমি বাসা বুনছিলাম কুমু! তোমার জন্য বুনছিলাম... আমাদের বাসা!"

"চুপ," কুমুদিনী ধমক দিল আমায়। বলল, "খালি কথা... কথা ছাড়া আর কিছু পারো না, না?"

আমি অবাক হলাম, "আর কী পারব?"

কুমুদিনী স্থির হয়ে তাকাল আমার দিকে। তারপর এগিয়ে এল। একটা ডানা দিয়ে আমায় টেনে নিল কাছে। আর এতদিন যে-তিলটাকে আমি দূর থেকে দেখতাম আজ জীবনে প্রথমবার দেখলাম একদম কাছ থেকে। তারপর আর কিছু দেখলাম না। শুধু স্পর্শ পেলাম। জীবনের।

(দু'দিন বাদে)

"হরি, টাকাটার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল?" জিতেশ তাকালেন হরির দিকে।

এই ঘরে আলো কম। শুধু একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। তার লালচে আলোয় জিতেশের মুখটা কেমন যেন লাগছে। জিতেশের চোয়াল শক্ত। চোখ দুটো এই আবছায়াতেও যেন জ্বলছে!

হরি নিচু গলায় বলল, "স্যার, এখনও তো ঠিক জানি না কী হল! মানে, বিজন যখন মারা গিয়েছে, ওর হাতে কোনও ব্যাগ ছিল না। সেদিন ও গাড়ি নিয়েও যায়নি! বাজাজ বলেছে ব্রিফকেসে পঁচিশ লাখ টাকা দিয়েছিল। ওর অফিসের ক্যামেরায় দেখেওছি বিজনকে ব্রিফকেস হাতে বেরতে! কিন্তু তারপর..."

"তোরা গাধা!" জিতেশ হিসহিসে গলায় বলল, "বিজন টাকা নিয়ে আমার কাছেই আসত সোজা। ওটা আমার প্রাপ্য টাকা। সেটা কোথায় গেল তবে? হাওয়া হয়ে গেল?"

হরি আমতা আমতা করল, "কিন্তু আমরা ওই জায়গায় নানান লোককে জিজ্ঞেস করেছি। তারা তো..."

"সিসিটিভি ফুটেজ দেখ। ঘটনার এক ঘণ্টা আগে থেকে ওই ট্র্যাফিক সিগনালে আর আশপাশের সব জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ দেখ। পুলিশকে আমার নাম করে বল, ওরা হেল্প করবে। ফুটেজে দেখ ওই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে কার হাতে ব্যাগ দিয়েছিল বিজন। খোঁজ নে বিজনের কাছের লোকজনের মধ্যে কার হাতে আচমকা টাকা এসেছে," জিতেশ আলোর সামনে ঝুঁকে বসল। তারপর চোয়াল শক্ত করে বলল, "খুঁজে দেখ, সে ছেলে না মেয়ে! যে আমার টাকা নিয়েছে সে কি ভেবেছে সব মিটে গিয়েছে? শোন, কিছুই মিটে যায়নি। কিছু মিটে যায় না। সে যদি ভাবে টাকা পেলাম, সব গুছিয়ে নিলাম আর গল্প শেষ হল, তবে সে ভুল ভাবছে। সে জানে না যে, নতুন করে আর-একটা গল্প শুরু হল এবার। রূপকথা গল্পের বইতে পাওয়া যায়। জীবনটা রূপকথা নয়। এটা মনে রাখবি।"

(কুমুদিনী, বাবুই আর ওদের ওই ছোট্ট বাসাটি ছাড়া বাকি গল্পটি বানানো।)

বাবুই • স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

|| ই-বুকটি সমাপ্ত হল ||

www.anandapub.in